দুষ্কৃতকারীদের কুকীর্তি

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাকদ্বীপ মহকুমা দপ্তরে হামলা ও লুটপাট

কাকদ্বীপ মহকুমা দপ্তর

হামলার পরের অবস্থা

সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে মানুষের অধিকার, গণতন্ত্র, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দমন করার জন্য লাগাতার ভাবে যে সন্ত্রাস-রাজ কায়েম করার চেষ্টা চলছে তার প্রকাশ ঘটল গত ১৬ মে' ১৪ লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই। আক্রান্ত হল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মহকুমা দপ্তর। ১৬ মে'১৪ রাত ৯টা নাগাদ ৩০-৪০ জনের দুষ্কৃতকারির একটি দল মহকুমা দপ্তরের দরজা ভেঙে দপ্তর তছনছ করে চুরি করে নিয়ে গেল কাঠের ও প্লাস্টিক চেয়ার টেবিল, কাঠের এবং স্টীলের আলমারি। পাখা, টিউব লাইট পর্যন্ত চুরি করা হল। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং অন্যান্য সংগঠনগুলির জরুরি প্রয়োজনীয় নথিপত্র, পত্রিকা, কাগজপত্র, লণ্ডভন্ড করে সারা ঘরে ছড়িয়ে তাণ্ডব চালানো হল। সম্পূর্ণ আসবাবশূন্য করা হল এই দপ্তরটি। এর আগে ২০১১ এবং ২০১৩ সালে এই দপ্তরে হামলা চালানো হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল এই দপ্তরের কাজকর্ম বন্ধ করে গোটা কাকদ্বীপ অঞ্চলে কর্মচারী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়া। সন্ত্রাসের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা। ঘটনার পরে স্থানীয় থানায় বিষয়টি

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

কর্মচারী ভবনে ১২৫তম মে দিবস উদযাপন

নিষ্ঠা ও ঐতিহ্যের অপরূপ মেলবন্ধন

কর্মচারী ভবন থেকে শহীদ মিনারের পথে মিছিল

প্রতি বছরের মতো প্রখর দহনকে উপেক্ষা করে ব্যাপক সংখ্যক কর্মচারী জমায়েতে একান্ত নিষ্ঠা ও ঐতিহ্যের সাথে কর্মচারী ভবনে পালিত হল এবারের মে দিবসের কর্মসূচী।

শুরুতেই রক্তপতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র। শহীদদের প্রতি সম্মান জানানোর পর প্রাথমিক প্রস্তাবনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। তিনি বলেন, ১৮৮৬ সালের শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম এবং তার তাৎপর্য আজও প্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্র সমাজের অভ্যন্তর থেকে উদ্ভূত। সমাজে দুটি শ্রেণী, শোষক ও শোষিত, শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বে রাষ্ট্র পুঁজির পক্ষ নেয় এবং পুঁজিপতি শোষণ চালায় এবং শ্রমশক্তিকে আত্মসাৎ করে। হে মার্কেটের শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টার কাজের দাবি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

(চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

রক্তপতাকা উত্তোলন করছেন সভাপতি অশোক পাত্র

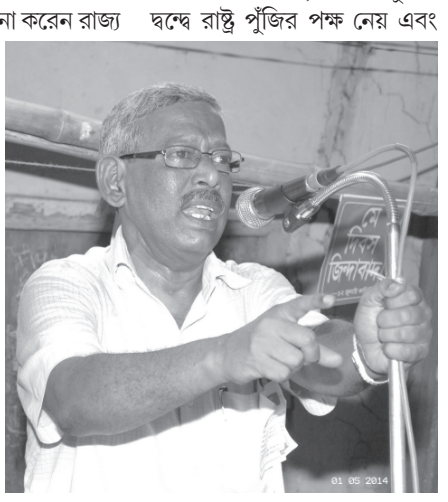

বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ

সংগঠনের ওয়েবসাইট

প্রচারের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

বহু আকাঙ্খার অবসান ঘটিয়ে সংগঠন প্রচার যোগাযোগের নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করল এরই মধ্যে। আত্মপ্রকাশ ঘটলো সংগঠনের ওয়েবসাইটের। যার নাম www.statecoord.org। তথ্য-প্রযুক্তি শিল্প বিজ্ঞানের আধুনিক অধ্যায়। বিজ্ঞানের যা কিছু অবদান তা সমস্ত মানবজাতির সমানভাবে সম্পদ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারের পিছনে আছে ঐতিহাসিকভাবে উন্নত মানুষের সমষ্টিগত, পরম্পরাগত মেধা, যা ক্রমশ আকাশ ছুঁতে চায়। তার হাত ধরেই এসেছে তথ্য প্রযুক্তি।

কিন্তু শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ন্যায্য যা সমস্ত মানুষের সম্পদ, তা হস্তগত হয়ে আছে ক্ষমতাসীন শ্রেণীর হাতে। বিজ্ঞানের আর সব ক্ষেত্রের মতো তা তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শ্রমজীবী মানুষ এই হকের পাওনা বুঝে নিতে চায় সবসময়। তাই এই ক্ষেত্রকে আমাদের সংগ্রাম- আন্দোলন-সংগঠনের সহায়ক উপাদান হিসাবে ব্যবহারের প্রসঙ্গ আমাদের সামনে এসেছে। সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনে আলোচিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে অবশেষে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাত্রা শুরু করেছে সংগঠনের ওয়েবসাইট।

ওয়েব সাইটের খুটিনাটি

ওয়েবসাইটের নাম ঃ

www.statecoord.org

প্রাথমিকভাবে সংগঠনের নাম ও সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের কোলাজ দিয়ে সূচনা হয়েছে হোম পেজ-এর ছবি। মেনু প্যানেলে আছে Home, Programme & Movement, Social Event, Gallery, Memorandum, Sangrami Hatiar, Publication, Zilla/Anchal/ Samiti Sangbad এবং Poll।

এর প্রতিটি নামের মধ্যে পরিস্কার ঐ মেনুতে ক্লিক করলে কি কি তথ্য পাওয়া যাবে। মেনু প্যানেলের সংগ্রামী হাতিয়ার মেনুতে সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রতিটি সংখ্যার PDF ফাইল আপলোড করা হবে যাতে আমরা সবাই দ্রুত সেই সংখ্যা বের করে দেখতে পারি। Poll অর্থাৎ vote মেনুতে আমরা প্রয়োজনে রাজ্য জুড়ে কোন বিষয়ে সমস্ত কর্মচারীদের মতামত নিতে পারি তার জন্য তৈরি করা হয়েছে। সাইটের মধ্যে ইতিহাসের পাতা

(চতুর্থ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

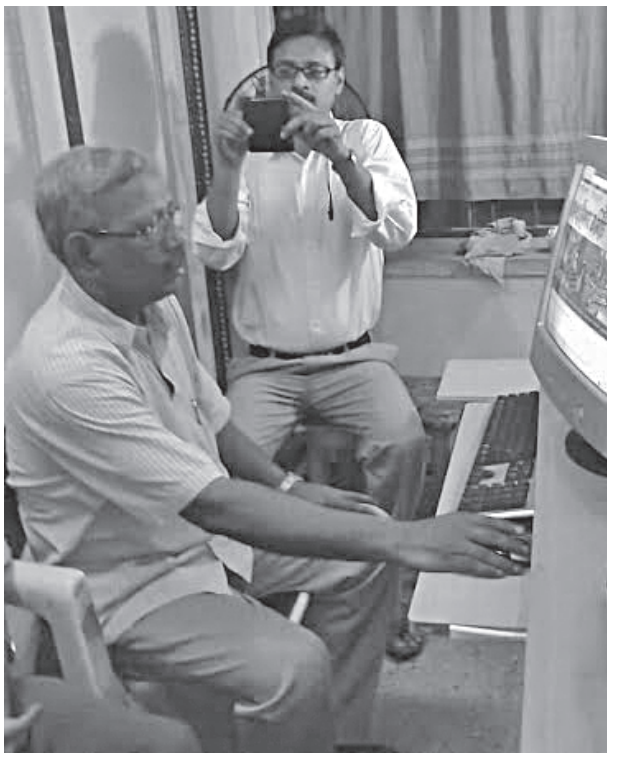

ওয়েব সাইটের উদ্বোধন করছেন মনোজ কান্তি গুহ

সংগ্রামী হাতিয়ার
মে ২০১৪
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৩তম বর্ষ □ প্রথম সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

লোকসভা নির্বাচন শেষ—বিপদ বাড়ল, কমল না

লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ন'দফায় অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল প্রধান প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রচারে বিপুল অর্থব্যয় এবং বাণিজ্যিক জগতের অনুকরণে এবং ভাষায় প্রচার কৌশল নির্মাণ। এই দুটি বিষয়েই সকলকে টেক্কা দিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। আমাদের দেশে নির্বাচন বিধি অনুযায়ী যেহেতু প্রার্থী পিছু খরচের উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট রয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক দল পিছু এমন কোন বিধি নিষেধ নেই, সেই সুযোগটাকে বেশ কিছু রাজনৈতিক দলই ব্যবহার করেছে। যেমন আমাদের রাজ্যের শাসকদল। তাদের নির্বাচনী খরচের বহরও ছিল তাক লাগানোর মতই। তবে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি যে হারে খরচ করেছে, তার কোন তুলনামূলক নিদর্শন বর্তমান কেন অতীতেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। একথাও এখন আর অজানা নেই যে, কর্পোরেট কর্তারাই দু-হাত উপুড় করে বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদীর প্রচারে অর্থ ঢেলেছে। বিপুল অর্থের স্রোতের পাশাপাশি যা চোখে লেগেছে তা হল, প্রচার পরিকল্পনার অভিনবত্ব। সাধারণত নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রচার যেভাবে হয়, এবারের প্রচারের ভাষা ছিল অনেকটাই আলাদা। বরং অনেক বেশি মিল ছিল বাণিজ্যিক পণ্যের বিজ্ঞাপনের ভাষার সাথে। কোন একটি পণ্যকে বাজারে পাঠানোর আগে, তার চাহিদা তৈরী করার জন্য যেভাবে বিজ্ঞাপনে গুণাগুণের ব্যাখ্যান হয়, ঠিক সেভাবেই বিজেপি দল ও তার প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসা হয়েছে। ঠিক যেমন বিজ্ঞাপনে দেখা যায় একটি বিশেষ ধরনের ক্রীম ব্যবহার করলে যাদের গায়ের রং কালো এমন সকলেই ফরসা হয়ে যেতে পারেন, ঠিক তেমনই নরেন্দ্র মোদী হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি ক্ষমতায় বসলেই সারা দেশের অজস্র সমস্যার এক লহমায় সমাধান হয়ে যাবে। অর্থাৎ, তিনি, একমাত্র তিনিই হলেন গরীব কৃষক, ক্ষেতমজুর, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত কর্মচারী, কর্মহীন যুব সমাজ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ ব্যবসায়ী সকলেরই ত্রাণ কর্তা, মসিহা। তিনি যে দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই দলের দর্শন কি, সরকার পরিচালনায় তাদের অতীতের ট্র্যাক রেকর্ড কি, বা বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিরও প্রশাসক হিসেবে অতীতে ভূমিকা কেমন ছিল ইত্যাদি কোন বিষয়কেই সামনে আসতে দেওয়া হয়নি। আবার বাজারে কোন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করার জন্য যেমন ফ্রি-গিফ্‌টের ব্যবস্থা থাকে, তেমনই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নামের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল 'গুজরাট মডেল'। অর্থাৎ ওনাকে জেতালেই ফ্রি-তে পেয়ে যাবেন 'গুজরাট মডেল'। গুজরাট মডেলটি যে কি বস্তু এ সম্পর্কে অধিকাংশ ভারতবাসীর কোন ধারণা তখনও ছিল না এখনও নেই। নির্বাচনী প্রচার শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত এহেন গুজরাট মডেলের মাহাত্ম্য কখনও শোনা যায় নি। কেউ কেউ প্রচারের এই ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়েও বলার চেষ্টা করলেন, গুজরাট মডেল সর্বরোগ নিরাময়ের দাওয়াই হয় কিভাবে? গুজরাটেও অভাবের তাড়নায় কৃষক আত্মহত্যা করছে, অসংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জাতীয় গড় মজুরির হারের তুলনায় গুজরাটের জরি শিল্পের শ্রমিকদের মজুরির হার কম, ওখানে প্রসূতি নারীদের অপুষ্টির হার অন্যান্য বহু রাজ্যের থেকে বেশি, স্কুল ছুট বালক-বালিকার সংখ্যাও নিতান্ত কম নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সমস্ত ধরনের গণমাধ্যম এবং তথ্যপ্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রকে ব্যবহার করে প্রচারের যে 'সুনামি' তৈরি করা হয়েছিল, তাতে এই সমস্ত মৃদু সমালোচনা খড়-কুটোর মতন ভেসে গেছে।

বামপন্থীরা নির্বাচনী প্রচারের প্রকৃত মর্মার্থকে অনুসরণ করে প্রতিটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যা ধরে ধরে সমাধানের পথ বাতলানোর চেষ্টা করেছেন। নির্বাচনী প্রচারের এটি দস্তুর হলেও, তাদের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও চিরাচরিত প্রচার-পদ্ধতি সবল হাইটেক প্রচারের কাছে ধরাশায়ী হয়েছে। যে কথাগুলি সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন ছিল, তা না পৌঁছে, পৌঁছেছে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা মিথ, যার সাথে বাস্তবের কোন মিল নেই। যে লক্ষ্যে কর্পোরেট কর্তারা তাদের স্লোগান 'আবকি বার মোদি সরকার'-কে আমজনতার স্লোগানে পরিণত করতে চেয়েছিলেন তা সফল হয়েছে। বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে প্রায় তিন দশক পরে কার্যত একদলীয় সরকার কায়েম হয়েছে দিল্লিতে। প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন তাদের বড় আদরের নরেন্দ্র মোদীজী। স্বভাবতই উৎফুল্ল আম্বানি-আদানি গোষ্ঠী। ১০০ দিনের মধ্যে সরকারের কি কি করা উচিত তার তালিকা প্রস্তুত করতে শুরু করেছে। যার মধ্যে রয়েছে আর্থিক ক্ষেত্র সহ সমস্ত ক্ষেত্রের আরও বেশী উদারীকরণ, বিদেশী পুঁজি অনুপ্রবেশের অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা, আর্থিক ঘাটতি কমানো এবং আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য জনকল্যাণমূলক অপ্রয়োজনীয় খাতে (কর্পোরেটদের মতে) ব্যয় হ্রাস, শিল্প-বান্ধব জমি নীতি, পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্রের বিধি-নিষেধ শিথিল করা, শ্রম আইন সংশোধন, সরকারী নিয়ন্ত্রণকে সংকুচিত করে বাজারের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা প্রভৃতি।

প্রেসক্রিপশনে চোখ বোলালেই বোঝা যায়, এখানে সাধারণ মানুষকে সুস্থ করার কোন ওষুধ লেখা নেই। যা লেখা আছে তা কর্পোরেট কর্তারা নিজেদের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য লিখেছেন। ড. মনমোহন সিং-এর হাতেও এই প্রেসক্রিপশন তুলে দেওয়া হয়েছিল। একদা মনমোহন সিং-ও তাদের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু শরিকি ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে তিনি প্রভুদের সবটা খুশি করতে পারেন নি। এখন মোদীজী একাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শরিক থাকলেও শরিকি ক্র্যাচের প্রয়োজন নেই। কর্পোরেট-সেবী অর্থনীতিতে মনমোহন সিং-এর পান্ডিত্য ছিল অনেক বেশি, কিন্তু মোদীজী চরিত্রগতভাবে অনেক বেশি আগ্রাসী। তাই মনমোহন সিং যেখানে হোঁচট খেয়েছেন, সেই প্রতিবন্ধকতাকে পায়ের তলায় পিষতে পারবেন মোদীজী এই বিশ্বাস কর্পোরেট জগতের রয়েছে। তাই মনমোহন সিং এখন দুর্বল, মোদীজী সবল। তাই সবল মোদীজীর অর্থনৈতিক সংস্কারের বুলডোজারকে দ্রুত চালু করতে বলছেন কর্পোরেট কর্তারা। যে কয়েক হাজার কোটি টাকা নির্বাচনী প্রচারে খরচ হল, তা সুদে আসলে তুলতে হবে তো। কর্পোরেটরা যখন আনন্দে 'পার্টি' করছেন, তখন নড়েচড়ে বসছে আর এস এসও—যারা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রকৃত রাজনৈতিক 'মেন্টর'। ভোট-বাজারে বিপণনের জন্য যে ব্র্যান্ড তৈরী করা হয়েছিল, তাতে কর্পোরেটদের পাশাপাশি সংঘ পরিবারেরও মালিকানা ছিল। তাই গুজরাট মডেলের পাশাপাশি প্রচার পর্বে স্মিতহাস্যে কখনও কখনও মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন পৌরাণিক কাহিনীর মহানায়ক রাম। সুতরাং হিন্দুত্ববাদী দর্শনের প্রচারের এই সুযোগ তারা ছাড়বে কেন? সরসঙ্ঘচালকেরা ইতোমধ্যে রওনা দিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, তাদের নির্জীব, মৃতপ্রায় শাখাগুলিকে চাঙ্গা করতে। বিদেশী পুঁজির কাছে দেশের অর্থনীতিকে হাট করে খুলে দেওয়া আর রামজন্মভূমি নির্মাণের জন্য উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভাবাবেগ তৈরী করা—দু-এরই তোড়জোড় শুরু হবে অচিরেই।

অর্থনীতিতে লগ্নীপুঁজির দাপট বৃদ্ধি এবং সমাজ ও রাজনীতির গৈরিকিকরণ—আগামী কয়েকবছর এই যুগলবন্দী প্রত্যক্ষ করতে হবে সমগ্র দেশবাসীকেই। স্বভাবতই বিপদ বাড়ল বৈ কমল না। মধ্যবিত্ত তথা রাজ্য কর্মচারীদেরও নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলায় সতর্ক থাকা জরুরি। □

২৭ মে, ২০১৪

সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল....

সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে মদীয় রাজ্যের শাসকদলটি আসন সংখ্যার নিরিখে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিকে অনেকখানি পিছনে ফেলিয়া দিয়াছে, যদিও প্রাপ্ত ভোটের হারে এই সাফল্য প্রতিফলিত হয় নাই, বরং বিগত বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় সামান্য ক্ষয়ের চিহ্নই পরিলক্ষিত হইয়াছে। উপরন্তু শাসকদল জয়ী হইয়াছে এমন বিভিন্ন কেন্দ্রের বুথওয়ারি ফলাফল যাহা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে দুধ (প্রকৃত ভোট) কার্যত নাই, ভোটযন্ত্র কেবলই জলময় (ছাপ্পা ভোট)। এই সমস্ত বাহুবলী-দর্প শোভিত বুথগুলিতে প্রধান বিরোধীদলের প্রাপ্ত ভোট দ্বি-সাংখ্য মানে পৌঁছাইতেও সক্ষম হয় নাই। যাহাই হউক, 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' বিদ্যাটি দক্ষতার সাথে রপ্ত করিয়া শাসকদল যে সাফল্যের উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। এই বিপুল সাফল্যে তাহাদের উল্লাস স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল এই উল্লাসের বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাইতেছে না। ঐ দলটির শীর্ষতম স্থান হইতে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত সকলেই অকস্মাৎ মৌনব্রত পালন করিতেছেন। পান হইতে চুন খসিলেই যিনি স্বীয় অননুকরণীয় ভঙ্গিমায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিতে অভ্যস্ত, সেই তিনিও বিপুল এই জয়ের পরবর্তী পর্বে মুখে কুলুপ আঁটিয়াছেন। অন্তত হেলিকপ্টার বাহনের বিপুল ব্যায়ভার এই জয়ের মাধ্যমে সার্থক হইয়াছে—তাহাও বলেন নাই। শাসকদলের এই নিরাসক্ত ভঙ্গিমায় বঙ্গবাসী আশ্চর্যান্বিত হইতেছেন। হইল কি উহাদের? নির্বাচনের দিন পর্যন্ত যাহারা, যে লক্ষ্যে যারপরনাই হুমকি প্রদর্শন করিল, বল প্রয়োগ করিল, সেই লক্ষ্যপূরণ হইবার পর তাহারাই নিরাসক্ত অহিংসবাদীতে পরিণত হইল কেন? বহুক্ষণ যাবৎ মস্তকের কেশরাজি উৎপাটন করিবার পর একটি সম্ভাব্য কারণের ক্ষীণরেখা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাহা হইল বহু আসন লাভ করিলেও, যে লক্ষ্যে বহু আসনের বাসনা লালিত হইতেছিল, তাহা অধরাই থাকিয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আরোহণ বা নির্ণায়ক শক্তি হইবার বাসনা পূরণ না হইবার ফলেই সম্ভবত তৃষ্ণীভাব, এই অঘোষিত শোকপালন। কারণ নির্বাচনে, তাহা যে স্তরেরই হউক না কেন, জয়লাভ যদি ক্ষমতার আস্বাদ না আনিতে পারে, তাহা হইলে লাভ কি? সংসদে শুধুমাত্র বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের নিমিত্ত কি এত বাক্য, অর্থ, বল ও সময় ব্যায় করা হইল? কেন্দ্রীয় ক্ষমতার মধুভান্ড স্পর্শ করিতে ব্যর্থ হইবার ফলেই এই বিমর্ষ মনোভাবের প্রতিফলন ঘটিতেছে এবং ইহাই একমাত্র কারণ তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা সম্ভব না হইলেও অন্যতম কারণ যে বটে ,তাহা লইয়া সংশয় নাই। জন্মাবধি এই দলটি যেনতেনপ্রকারেণ কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় অংশীদার হইতে চাহিয়াছে। ঘন ঘন জোট বদল, জোটে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রীত্ব লাভ, পরবর্তীতে এক জোটের অবস্থা সঙ্গীন বুঝিয়া নীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পদত্যাগ এবং অপর জোটে অংশগ্রহণ— বিগত কতিপয় বৎসরের এই স্থায়ী চিত্রনাট্যটি বিপর্যস্ত হইবার ফলেই সম্ভবতঃ এরূপ বিমর্ষ মনোভাব ব্যক্ত হইতেছে। এক্ষণে বঙ্গবাসীর মনেও একটি প্রশ্ন উঁকি মারিতেছে। তাহা হইল, এই বিমর্ষ মনোভাবের প্রতিফলন কি সংসদ অধিবেশনেও ঘটিবে? বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যখন আলোচনা চলিবে তখন কি ঐ দলটির জনগণের রায়ে অথবা বাহুবলীদের আস্ফালনে বিজয়ী প্রার্থীগণ চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকিবেন? মন্ত্রীত্ব প্রাপ্তি হইল না বলিয়া কি, সাংসদের ভূমিকা পালনে তাঁহারা উৎসাহ হারাইবেন? তাহা হইলে মানুষের কথা বলিবেন কাহারা? □

১২ জৈষ্ঠ, ১৪২১

শোক সংবাদ

বরদা ভট্টাচার্য্য

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আন্দোলন তথা মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের নেতৃত্ব এবং ১২ই জুলাই কমিটির প্রাক্তন যুগ্ম-আহ্বায়ক কমরেড বরদা ভট্টাচার্য্য গত ১৩ মে কলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৫।

কমরেড বরদা ভট্টাচার্যের জন্ম বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায়। ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সি আর টি অডিট দপ্তরে চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯৬০ ও ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটে অংশ নিয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। ১৯৭৪ সালে রেল ধর্মঘটে অংশ নেওয়ার জন্য তিন সপ্তাহের কারাবাস হয়। ১৯৮৬ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন।

তিনি আটের দশকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক-এর দায়িত্ব পালন করেন। ১২ইজুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন তিনি। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ সেন্ট্রাল গভঃ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় দায়িত্বে ছিলেন এবং তিরিশ বছর ধরে অল ইন্ডিয়া অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের রেল প্রতিরক্ষা সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারী আন্দোলনের মঞ্চ ইউনাইটেড মুভমেন্ট কমিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি।

কমরেড ভট্টাচার্য বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত বেতন কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

কমরেড ভট্টাচার্যর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নার্সিংহোমে উপস্থিত হন সি আই টি ইউ রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী, কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা দীপেন ঘোষ প্রমুখ। তার মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন বামপন্থী আন্দোলনের নেতা বিমান বসু, বিনয় কোঙার, শ্যামল চক্রবর্তী, রবীন দেব, সুখেন্দু পাণিগ্রাহী, এস এফ আই সাধারণ সম্পাদক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, গণশক্তি পত্রিকার সম্পাদক নারায়ণ দত্ত, অভীক দত্ত, দেবাশিস চক্রবর্তী, নন্দন পত্রিকার সম্পাদক অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী, দেশহিতৈষী পত্রিকার সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সি আই টি ইউ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীপক দাশগুপ্ত, রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। □

সুভাষ দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ ওয়ার্ক এ্যাসিস্ট্যান্টস এ্যাসোসিয়েশন-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড সুভাষ চন্দ্র দত্ত দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ১৪-৫-২০১৪ তারিখে দমদমে নিজস্ব বাসভবনে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর। কমরেড দত্ত ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবাসন দপ্তরে ওয়ার্ক এ্যাসিস্ট্যান্ট পদে যোগদান করেন। প্রথম থেকেই তিনি পশ্চিমবঙ্গ ওয়ার্ক এ্যাসিস্ট্যান্টস এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হন। সমিতির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক কমরেড দীনেন্দ্র নাথ গুহঠাকুরতার সান্নিধ্যে ও অনুপ্রেরণায় কমরেড দত্ত সমিতির সদস্য থেকে ক্রমান্বয়ে নেতৃত্বের স্তরে আসীন হন। ১৯৭০ সালে তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। রাজ্যে সেই সময় আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়েও মতাদর্শে অবিচল কমরেড দত্ত বলিষ্ঠভাবে কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৮২ সালে তিনি সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং একটানা ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ওই পদে আসীন ছিলেন। ১৯৯৭ সালে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং প: ব: রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সদস্য হন কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি এলাকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। ২০০৫ সালে তিনি দক্ষিণ দমদম পৌরসভার কাউন্সিলার নির্বাচিত হন।

কমরেড দত্ত-র মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সমিতির কর্মী-নেতৃত্ব সহ পেনশনার্স সমিতির দমদমস্থিত নেতৃবৃন্দ তার বাসভবনে ছুটে যান। এলাকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব ও অনেক মানুষ উপস্থিত হন। বাসভবনেই মরদেহে এক এক করে মাল্যদান করেন সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকত্রয় সুবিমল ব্যানার্জী, সমীর ব্যানার্জী, নির্মলেন্দু ঘোষ, সহ সভাপতি প্রভঞ্জন ঘোষ সহ সমিতির বর্তমান ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণ। পেনশনার্স সমিতির নেতৃত্বগণও মাল্যদান করেন। এরপর এলাকার বামপন্থী রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বগণ এক এক করে মাল্যদান করার পর কলকাতার এন আর এস হাসপাতালে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে সহ সম্পাদকদ্বয় বিজয়শঙ্কর সিনহা ও বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, আশীষ ভট্টাচার্য, অচিন্ত বিশ্বাস, হিমাংশু রায় সহ পূর্বাঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বরাও মাল্যদান করেন। সমিতির নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে রাত ৯টায় কমরেড দত্তর মরদেহ এন আর এস হাসপাতালে দান করা হয়।

কমরেড সুভাষ চন্দ্র দত্ত-র প্রয়াণে সমিতির সদস্যগণ সহ অন্যান্য কর্মচারীরাও মর্মাহত। □

অমিতাভ বসু

বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী সৈনিক কমরেড অমিতাভ বসু গত ১৭ মে গভীর রাতে বারাসতের একটি হাসপাতালে প্রয়াত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২। তিনি সি.পি.আই(এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। প্রায় দুই দশক ধরে তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির সম্পাদক ছিলেন।

বাংলাদেশের যশোহর জেলায় শিরিষ দেওয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলন, উদ্বাস্তু আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বর্তমান।

ষাট ও সত্তরের দশকে ছাত্র ও যুব আন্দোলনের অগ্রণী নেতা ছিলেন কমরেড অমিতাভ বসু। গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি ছিলেন। কমরেড অমিতাভ বসুর অঙ্গীকার অনুযায়ী তাঁর মরদেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে দান করা হয়। □

যে পথ ধরে মে দিবস

সুমিত ভট্টাচার্য

মে দিবস প্রতিপালনের ইতিহাস এই বছর ১২৫তম বর্ষে পদার্পণ করল। ১৮৯০ সালের ১ মে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে মে দিবস প্রতিপালিত হয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষত ইউরোপের দেশগুলিতে। ফ্রেডেরিক এঙ্গেলসের উদ্যোগে গঠিত শ্রমজীবীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক) এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মে দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, ১৮৮৬ খ্রী. শিকাগো শহরের হে মার্কেটে আমেরিকার শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ লড়াই, ধর্মঘট ও আত্মবলিদানকে স্মরণ করা ও তা থেকে প্রেরণা লাভ করার জন্য। তারপর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মে দিবস প্রতিপালিত হচ্ছে সারা বিশ্বে। কিন্তু মে দিবস প্রতিপালনের তাৎপর্য ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এর পরিধি ক্রমশই বড় হয়েছে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দাবি যুক্ত হতে হতে, রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবিও মে দিবসের দাবি সনদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবার যখন শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব রাষ্ট্রব্যাবস্থা গড়ে উঠেছে, রাষ্ট্র পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন মে দিবস হয়েছে উৎসবের দিন। এক কথায় মে দিবস শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষের অধিকার অর্জন ও অর্জিত অধিকার রক্ষার শপথ গ্রহণের দিন।

মে দিবসের এই বহুমাত্রিক তাৎপর্য এবং ঐতিহাসিক পরম্পরার কারণেই, প্রাক্ মে দিবস পর্বের শ্রমিকশ্রেণীর বহু গুরুত্বপূর্ণ লড়াই অনেক সময়েই প্রচারের আড়ালে থেকে যায়। এমনও ভ্রান্ত ধারণা কেউ কেউ পোষণ করেন, হে মার্কেটের ঘটনাই বিশ্বের প্রথম সাড়া জাগানো শ্রমিক আন্দোলন। যা আদৌ সঠিক নয়। আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মূলত ইউরোপের দুটি দেশ ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে। সময়ের নিরিখে যা মে দিবসেরও প্রায় একশ বছর আগে। এবং ইতিহাসের পাতা ওল্টালে শ্রমিকশ্রেণীর বহু গুরুত্বপূর্ণ লড়াই-এর কথা জানা যায়, যেগুলির ধারাবাহিকতাতেই ঘটেছিল 'মে দিবস'-এর সংগ্রাম। তবে ঔজ্জ্বল্যের দিক থেকে 'মে দিবস' বা হে মার্কেটের লড়াই অগ্রগণ্য কেন তা বিচার করা প্রয়োজন। তবে তার আগে, প্রাক্ মে দিবস পর্বে শ্রমিক আন্দোলনের যে বিবর্তন বা ইভোলিউশন, যা ইতিহাসে অপেক্ষাকৃত স্বল্প আলোচিত অধ্যায় সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

(দুই)

প্রকৃত অর্থে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা পর্ব বা উৎস ছিল মহান ফরাসি বিপ্লব। যদিও শিল্প শ্রমিকেরা সেই সময় নিজস্ব শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত হয় নি। তবুও গণতান্ত্রিক জনগণের অংশ হিসেবেই রাজতন্ত্রের ভয়াবহ শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রথম সারির নির্ভীক সেনানীর ভূমিকা পালন করেছিল। সংখ্যায় কম, শহরের দরিদ্র শোষিত জনগণের মাত্র ৩০ শতাংশ হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে তারা বিন্দুমাত্র পিছুপা হয় নি।

ফরাসি বিপ্লবেই উচ্চারিত হল সেই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য যা শ্রমজীবীদের চেতনার বন্ধ দরজাটাকে অনেকটাই খুলে দিল—যতদিন পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, সমাজের নীচের তলায় শ্রমজীবীদের জীবনে সাম্য আসবে না। যিনি প্রথম এই সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, ফরাসি বিপ্লবের সেই নেতা হলেন ব্যাবুফ। ব্যাবুফ আন্দোলনের যে ধারাটিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তার নাম ছিল 'কনস্পিরেসি অফ ইকুয়াল।' ব্যাবুফ ব্যাক্তিগত মালিকানা ধ্বংস করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি গণতান্ত্রিক ফ্রান্সের সংবিধানের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলির বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম শুরু করেন ১৭৯৫ সালে। তিনি আরও দাবি করেছিলেন, সরকার এবং ব্যাঙ্কারদের গরীব মানুষের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করতে হবে। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ধ্বংস করে কৃষিতে যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠার দাবি করেছিলেন তাঁরা। মানুষ সমাজের কাছ থেকে জীবন ধারণের উপকরণ পাবে তাঁদের পরিশ্রমের পরিমাণের ভিত্তিতে নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী—সাম্যবাদী সমাজের এই মৌলিক ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ব্যাবুফের কর্মসূচীতে। এই প্রসঙ্গে আরও যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হল, ব্যাবুফ যখন বুর্জোয়া ব্যবস্থার ভিত্তি ব্যক্তিগত মালিকানা ধ্বংসের কথা বলছেন, তখনও বুর্জোয়ারা রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করছেন। বুর্জোয়া ও সর্বহারার দ্বন্দ্বের রূপটি তখনও এতটা প্রকট হয়নি।

ইন্দোনেশিয়ায় মে দিবসের বিশাল সমাবেশ

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনের মধ্য দিয়েই সামাজিক মুক্তি সম্ভব, ব্যাবুফের প্রচেষ্টার তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলন এই ভাবনায় দীক্ষিত হয়েছিল। এই ভাবনাকেই আরও বিকশিত করেছিলেন ব্রিটিশ কল্পবাদী সমাজতন্ত্রী সেন্ট সাইমন, ফুরিয়র প্রমুখরা। সেন্ট সাইমনই প্রথম সমাজের শ্রেণী বিভাজন এবং শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেছিলেন। যদিও শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশের মধ্য দিয়েই, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব—এই ধারণায় তিনি পৌঁছতে পারেন নি। স্বভাবতই মে দিবসের বহু আগেই শ্রমিক আন্দোলনে সমানাধিকারের দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। বুর্জোয়াদের শুভবুদ্ধির উদয়ের মধ্য দিয়েই সমানাধিকারের স্বার্থে একটি পৃথক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব, সাইমনের মতই ফুরিয়ার বা রবার্ট ওয়েনও এই ধারণাতেই আটকে গেছিলেন।

ফরাসি বিপ্লবে শ্রমিকরা যেমন সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদে বুর্জোয়া শ্রেণীকে সহায়তা করেছিল, ইংল্যান্ডেও তাদের ভূমিকা ছিল একই। ইংল্যান্ডে যে 'রিফর্ম বিল'-কে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ শ্রমজীবীরা প্রথম ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তা ছিল বুর্জোয়াদের কর্মসূচী। পার্লামেন্টকে সামন্তপ্রভুদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে সেখানে ধনিকশ্রেণী ও শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই ছিল 'রিফর্ম বিল'—আন্দোলনের লক্ষ্য। কিন্তু ফরাসিদের মতই ইংরেজ ধনিক শ্রেণীও সে দেশের শ্রমজীবীদের প্রতারিত করলেন। তাঁদের ভোটাধিকার দেওয়া হল না। শহরাঞ্চলে যে বিত্তবানরা খাজনা দিতেন, শুধুমাত্র তাঁদেরই ভোটাধিকার দেওয়া হল। ফলে সামন্ততন্ত্র বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্পর্কে শ্রমজীবীরা কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন। এরও আগে শ্রমিকশ্রেণী যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তা ছিল লুডাইট মুভমেন্ট। শোষণের তীব্র যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা অন্ধ আক্রোশে মেশিন ভাঙতেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে তাঁরা বুঝেছিলেন, ঐ পথ সমস্যা সমাধানের পথ নয়। তাই সংসদীয় ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলনে তাঁরা অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। পাশাপাশি ধনিকশ্রেণীও সামন্ততন্ত্রকে কোণঠাসা করতে শ্রমজীবীদের সহযোগিতা আরও বেশী প্রয়োজন অনুভব করে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া শুরু করে। যার অন্যতম ছিল, শ্রমজীবীদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আইনী অধিকার।

কিন্তু শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আইনী অধিকার (১৮৭৫) পেয়েই ইংল্যান্ডের শ্রমজীবীদের আন্দোলন থেমে যায়নি। আরও এক ধাপ এগিয়ে তাঁরা তৈরী করলেন নিজস্ব রাজনৈতিক দল চার্টিস্ট পার্টি। চার্টিস্ট পার্টির দাবিসনদ বা চার্টিজম-এ যে দাবিগুলি যুক্ত হয়েছিল, সেগুলি হল—(১) ২১ বছর বয়সে ভোটাধিকার, (২) গোপন ব্যালটে বাৎসরিক পার্লামেন্ট নির্বাচন, (৩) নির্বাচন অঞ্চলগুলির সুষম বিন্যাস, (৪) পার্লামেন্টে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে সম্পত্তির ভিত্তিতে যোগ্যতা বিচার না করা প্রভৃতি। তবে এই দাবি সনদে ত্রুটির দিক হল, নারীদের জন্য ভোটাধিকার দাবি করা হয়নি। পাশাপাশি চার্টিস্ট আন্দোলনের আরও একটি সীমাবদ্ধতার দিক হল, ব্রিটিশ রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদের কথা কখনও বলা হয়নি। তবুও শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার প্রসঙ্গটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস্। চার্টিস্ট আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ছিল, উপরোক্ত দাবি সনদের ভিত্তিতে সারা দেশ থেকে লক্ষাধিক মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ম্যাঞ্চেস্টারে এক লক্ষ মানুষের সমাবেশ থেকে পার্লামেন্টে সেই দাবি সনদ প্রেরণ।

যদিও সেই সময় শ্রমিকশ্রেণীর হাতে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো ছিল না, কোন বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের শিক্ষায় তখনও তাঁরা শিক্ষিত হন নি, তা সত্ত্বেও চার্টিস্ট আন্দোলনের মধ্যে একটি ধারা মনে করত সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ধনিকশ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া সম্ভব।

ব্যাপকতা এবং তীব্রতা সত্ত্বেও চার্টিস্ট আন্দোলন খুব বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। চার্টিস্ট আন্দোলনের পরবর্তী পর্বে দুটি ঘটনা সমগ্র ইউরোপকে উত্তাল করে তুলেছিল। ১৮৪৮ সালে একদিকে মার্কস্ ও এঙ্গেলস প্রকাশ করলেন তাঁদের ঐতিহাসিক গ্রন্থ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো—কল্পবাদী পথ ছেড়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক পথে শোষণহীন সাম্যবাদী ব্যবস্থায় উত্তরণের দিক নির্দেশ। অপরদিকে ঐ একই সময়ে ফরাসি দেশের রাজপথে শুরু হল শ্রমিকশ্রেণীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম—জুন বিপ্লব। সমকালীন হলেও ফ্রান্সের জুন বিপ্লব কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রভাবে সংগঠিত হয়েছিল একথা বলা যাবে না। এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণতই স্বতঃস্ফূর্ততা ভিত্তিক। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান নির্ভর বিশ্লেষণের মাধ্যমে মার্কস্-এঙ্গেলস যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, স্বতঃস্ফূর্ততা নির্ভর শ্রমিক আন্দোলনও প্রায় একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, যদিও পথ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ।

প্যারি কমিউন— ১৮৭১

জুন বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে ফরাসি শ্রমিকশ্রেণীকে যে অমানবিক নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তার তুলনায় হে মার্কেটের ঘটনা কিছুই নয়। শিকাগোর ঘটনায় দশ থেকে পনেরোজন শ্রমিক খুন হয়েছিলেন। আর জুন বিপ্লবে প্যারিসের রাজপথে ছড়িয়ে ছিল কয়েকহাজার শ্রমিকের গুলিবিদ্ধ লাশ। জুন বিপ্লব পরবর্তী পর্বে আরও দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা সংগঠিত হল। ১৮৬৪ সালে গড়ে উঠল বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের এক আন্তর্জাতিক মঞ্চ—ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস্ এ্যাসোসিয়েশন বা প্রথম আন্তর্জাতিক। ১৮৭১ সালে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থান ও ক্ষমতা দখল—প্যারি কমিউন। কিন্তু অত্যাচার ও রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়া হল প্যারি কমিউনকে। এঙ্গেলসের ভাষায়, নারী-শিশু নির্বিশেষে প্যারির রাস্তায় হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়েছিল। স্বভাবতই মে দিবসের বিপর্যয়ের ঘটনা প্যারি কমিউনের নির্দয়তার কাছে ছিল তুচ্ছ।

(তিন)

তবুও মে দিবস শ্রমজীবী আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম স্থান দখল করে আছে, কারণ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে মে দিবস আন্তর্জাতিক চরিত্র লাভ করল। ৮ ঘণ্টার কাজের দাবি, মজুরি দাসত্বের অবসান প্রভৃতি দাবির পাশাপাশি মে দিবসের অন্যতম দাবি ছিল আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্য। প্রাক্ মে দিবস পর্বে উল্লিখিত আন্দোলনগুলি এমন কোন আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন করতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে মার্কস একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একটি আন্তর্জাতিক সমাবেশে ফ্রান্সের শ্রমিকেরা যখন ফরাসি বিপ্লবের মৃত্যুঞ্জয়ী সঙ্গীত লা মার্সাই গাইছেন, তখন ইংল্যান্ডের শ্রমিকরা তার সাথে গলা না মিলিয়ে গাইলেন 'গড সেভ দ্য কিং'।

মে দিবসের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, প্রাক্ মে দিবস পর্বে যে ঐতিহাসিক লড়াইগুলি সংগঠিত হয়েছিল, সেগুলিতে নিজ নিজ দেশের পরিস্থিতিজনিত অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে শ্রমিক শ্রেণী কখনও বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে, আবার কখনও বুর্জোয়া শাসকদের বিরুদ্ধেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছে। কিন্তু কোন সাধারণ দাবি নিয়ে একাধিক দেশের শ্রমিক শ্রেণী পারস্পরিক সংহতি প্রকাশ করতে পারে নি। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মতন একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে মে দিবস প্রতিপালনের আহ্বান এসেছিল মজুরি দাসত্বের অবসানের মতন একটি মৌলিক দাবিকে কেন্দ্র করে। যা ক্রমান্বয়ে পৃথিবী ব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছিল। সর্বোপরি মে দিবসের চিরকালীন আবেদনের অপর একটি কারণ হল, এর সাথে শ্রমজীবীদের একাত্মতা বোধ। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে শ্রমজীবী মানুষ যে কোনো ধরনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হলে, তার বিরুদ্ধে লড়াই-এর প্রেরণা গ্রহণ করে মে দিবস থেকে। তাই মে দিবস চির অক্ষয়।□

দেশে দেশে এবারের মে দিবস

রাশিয়া

১ মে ২০১৪, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এই প্রথম মস্কোর রেড স্কোয়ারে মে ডে'র বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এই অনুষ্ঠানে জড়ো হয়। ক্রেমলিনে এই কর্মসূচীতে আবার 'Hero of Labour' মেডেল পাঁচজন শ্রমিককে দেওয়া হয়। যা স্তালিনের আমলে চালু হয়েছিল। গতবার থেকে এই পুরস্কার দেওয়া আবার শুরু হয়েছে পুতিন জমানায়। মস্কোর মেয়র সার্গেইট সোবিয়ানিন রাশিয়া ২৪ টিভিতে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন এই কর্মসূচীতে ১ লক্ষের বেশি মানুষ অংশ নিয়েছে। ক্রিমিয়ার রাজধানী সিমফেরোয়ুল-এ মে ডে'র কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়।

ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ দি ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল (আইসিএফআই) International Committee of the Fourth International (ICFI) র উদ্যোগে ৮৪টি দেশের শ্রমিক যুবকেরা Online May Day র‍্যালিতে অংশ নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে ১০জন বক্তা এই Online বক্তব্য রাখেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন, যুদ্ধবিরোধী, অসাম্য, একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল 'মে দিবসের কর্মসূচী'। World Socialist Website এবং The Daily Internal publication of the ICFI উদ্যোক্তা ছিল। ২ হাজারের বেশি মানুষ নথিভুক্ত হয়েছিল এবং ৭০০-র বেশি মতামত পড়েছিল এই অনুষ্ঠানে।

ইউক্রেন

ডোনেস্কে কয়েক হাজার মানুষ যাদের অধিকাংশ কমিউনিস্ট ও প্রো রাশিয়ান তারা সমবেত হন মে দিবস উদ্‌যাপনের জন্য। সমাবেশে পুরনো সোভিয়েত সামরিক গান গাওয়া হয়। প্রথম দিকে শান্তিতে সমাবেশ হলেও পরে ইউক্রেনের পুলিশ রাবার বুলেট, টিয়ার গ্যাস, Stun গ্রেনেড নিয়ে সমাবেশে আক্রমণ চালায়। রাস্তায় খন্ডযুদ্ধ শুরু হয় সমাবেশকারী ও পুলিশের মধ্যে।□

মানস দাস

কর্মচারী ভবনে মে দিবস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পায়। আমেরিকার অন্যান্য ফেডারেশনগুলিও ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি তোলে ধর্মঘটের মাধ্যমে। আসলে শ্রমিকদের ক্ষমতা বোঝায় ধর্মঘট। যে কারণে ১৮৮৬ সালে শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিতে ১৭০০ শিল্প কারখানায় ধর্মঘট হয়েছিল। বর্তমানে আমরা যে পরিস্থিতিতে রয়েছি, সেই পরিস্থিতি ভেদ করে

বক্তা প্রণব চট্টোপাধ্যায়

বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনে আরও বেশী লড়াই আন্দোলন ও ধর্মঘটের পথে যেতে হবে।

আসলে রাষ্ট্রের উপাঙ্গগুলি সর্বদা পুঁজির পক্ষে থাকে। শ্রমিকদের দমন করার জন্য এই উপাঙ্গগুলিকে রাষ্ট্র ব্যবহার করে, হে মার্কেটের ঘটনায় যা পরিলক্ষিত হয়। সে সময়

কর্মচারী ভবনে জমায়েতের একাংশ

এঙ্গেলস বলেছিলেন—এই প্রথম শ্রমিকশ্রেণী একই দাবিতে এক মঞ্চে সমবেত হয়েছে। ১৮৮৯-এ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে মে-ডে প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমানে সারা দেশে স্থায়ী পদের বিলুপ্তি ঘটছে। শ্রমিকশ্রেণী স্বল্প বেতনে অনিশ্চিত জীবন কাটাচ্ছে আর পুঁজিপতিদের বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে। আমাদের রাজ্যেও গণতন্ত্র নেই, বাক্‌স্বাধীনতা, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং নারীর সুরক্ষা নেই। কর্মচারী হিসাবে এই দুর্মূল্যের বাজারে আমাদের ৪২% মহার্ঘভাতা নেই, কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার। যথেচ্ছভাবে হয়রানিমূলক বদলি করা হচ্ছে। এ সময়ে মে দিবস নিছক পালন করা নয়, এর সংগ্রামী ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

এরপর বক্তব্য রাখেন সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রাক্তন সম্পাদক ও কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রণব চট্টোপাধ্যায়। তিনি ১২৫তম বর্ষের মে দিবসে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ১৮৮৯ সাল থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে ৮ঘণ্টা কাজের দাবিতে মে দিবস পালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, শ্রমিকদের উন্নত চেতনা, ঐক্যবদ্ধ ও জঙ্গি আন্দোলনের ফল মে দিবস। তাই ১২৫ বছরে সমকালীন পরিস্থিতিতে এর মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। ১৯৪৫-এ হিটলারের বিরুদ্ধে এবং ভিয়েতনামে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে মে দিবসের আদর্শ প্রেরণা জুগিয়েছে। দেশে ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারে জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় আলোচনায় নেই, শুধু প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী কে হবেন। ১৯৯১ পরবর্তীতে উদার অর্থনীতির প্রবর্তন দেশের সামগ্রিক জনজীবনকে প্রভাবিত করছে। যেখানে দেশের GDP বৃদ্ধির হার ৭% সেখানে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ০.৭% । মূল্যবৃদ্ধির হার উর্দ্ধমুখী। আয় ও সম্পদের বৈষম্য বেড়েছে কয়েকগুণ। কর্পোরেট কর্তারা যেখানে প্রতি ঘণ্টার ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা রোজগার করেন সেখানে দেশে ৭৭% মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে। দেশে প্রতি ঘণ্টায় যেখানে দারিদ্রের তাড়নায় ২জন কৃষক আত্মহত্যা করেন সেখানে মুকেশ আম্বানি ঘণ্টায় ৭ কোটি টাকা মুনাফা করেন। রঘুরাম রাজন কমিটির রির্পোটে গুজরাটের অবস্থান ত্রিপুরা সহ একাধিক রাজ্যের নীচে। মানবোন্নয়ন সূচকে দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে কেরালা ১ নম্বরে, গুজরাট ১২তে, গর্ভবতী মা ও শিশুদের অপুষ্টি এবং প্রাথমিক স্তরে শিশুদের স্কুল ছুটের সংখ্যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় গুজরাটে অনেক বেশি। তাহলে কেন কেরালা মডেল নয়, গুজরাট মডেল? কারণ কর্পোরেটকে জমি ভর্তুকিতে গুজরাট ১ নম্বরে। তাই কর্পোরেট হাউস তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করতে চাইছে। দেশে নব্য উদার আর্থিক নীতি প্রয়োগের ফলে দশ বছরে ১৫টা ধর্মঘট হয়েছে। এসব মোকাবিলা করতে দমনকারী প্রশাসক প্রয়োজন। মোদী হিংস্রতার দিক থেকে অন্য সকলের চেয়ে এগিয়ে। হর্ষ মান্দারের গুজরাট গণহত্যার বিবরণে যা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। হিন্দু ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মোদী একটা প্রোজেক্ট। আমাদের রাজ্যে বর্তমানে লুঠেরাদের রাজত্ব চলছে। ছাত্রনেতা সুদীপ্ত গুপ্ত সহ বহু বাম নেতা, কর্মী ও সমর্থক শাসক দলের গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশের হাতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গকে দুঃশাসন থেকে মুক্ত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ও বঞ্চনার অবসানে আমাদের চিরাচরিত ঐতিহ্য ও আত্মত্যাগের মানসিকতাকে সঙ্গী করে পরিবার পরিজন সহ রুখে দাঁড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে পরিবারের সকলেই যাতে দাবিগুলির সাথে একাত্ম হতে পারে আন্দোলনের মাধ্যমে সে দায়িত্ব নিতে হবে আমাদেরই। □

সুতপা হাজরা

মে দিবসে শহীদ মিনারে কেন্দ্রীয় সমাবেশ

গরীব শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য সুদৃঢ় করার আহ্বান

শহীদ মিনারে কেন্দ্রীয় সমাবেশ (ইনসেটে সমীর ভট্টাচার্য)

কাজের ঘণ্টা কমাবার সঙ্গে মে দিবসের জন্মকাহিনী অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে—কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবির রাজনৈতিক তাৎপর্য শ্রমিকশ্রেণীর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কারখানা ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকেই কাজের ঘণ্টা কমানোর আন্দোলন সেখানে দেখা যায়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত এই ছিল তখনকার দিনে কাজের ঘণ্টা। চৌদ্দ, ষোল এমনকি আঠারো ঘণ্টাও কাজের দিন তখন ছিল। না হলে কর্মচ্যুত হতে হতো। ইংল্যাণ্ড তথা দুনিয়ার প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন বলে খ্যাত ফিলাডেলফিয়ার মেকানিকদের ইউনিয়ন (১৮২৭) দশঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করে। ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে পর পর ধর্মঘট হয়। পরে দ্রুত এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে। অবশেষে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে এক শ্রমিক সমাবেশ থেকে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে সংগঠিত হয়েছিল ঐতিহাসিক লড়াই। আমাদের দেশ সহ পৃথিবীর সব দেশে শ্রমিকশ্রেণী মালিকের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম পরিচালনায় মে দিবস থেকে প্রেরণা নিতে বিভিন্ন সমাবেশ, আলোচনা সভার মাধ্যমে এই দিনটিকে স্মরণ করেন।

এবারকার ঐতিহাসিক মে দিবস পালিত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে। এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে এবং সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত শ্রমজীবী জনগণ শিকার হচ্ছেন মালিকশ্রেণী ও প্রশাসকদের অমানবিক মনোভাবের। কর্মসংস্থান ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং বহুক্ষেত্রে চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন শ্রমজীবী জনগণ। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে, গ্রাম ও শহরের সবধরনের গরীবের ঐক্যকে সুদৃঢ় করে প্রতিবাদে মুখর হতে কেন্দ্রীয় বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক কর্মচারীদের ফেডারেশন ও ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে শহীদ মিনার ময়দানে সমাবেশের মাধ্যমে ১২৫তম মে দিবস প্রতিপালিত হয়।

এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সরল দেব। বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে সমীর ভট্টাচার্য, এ আই টি ইউ সি-র নেতৃত্ব রনজিত গুহ, টি ইউ সি সি-র পক্ষে এস পি তেওয়ারি, ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে মিহির চন্দ, রেল শ্রমিক-কর্মচারীদের পক্ষে এস কে ব্রহ্ম, এবং বি এস এন এল শ্রমিক কর্মচারীদের পক্ষে অনিমেষ মিত্র। ১২-ই জুলাই কমিটির পক্ষে সমীর ভট্টাচার্য বলেন—সমগ্র মানবজাতি শান্তি ও সুখী ভবিষ্যতের দাবিতে সংগ্রামরত। প্রত্যেকটি দেশের শ্রমিকশ্রেণী মে দিবসে সেলাম জানায় দুনিয়ার জনগণকে—আন্তর্জাতিক সংহতি ও সহযোগিতার অনুপ্রেরণায়। আমরাও দুনিয়ার জনগণকে জানালাম আমাদের লাল সেলাম। □

কুমকুম মিত্র, শাশ্বতী মজুমদার

সংগঠনের ওয়েবসাইট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

থেকে প্রসঙ্গে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সৃষ্টির প্রাক পর্ব থেকে আজ অবধি সংক্ষেপে বিবৃত আছে।

মেনুবার-এর নীচে স্ক্রল- এ আমাদের এই সময়ের কথা, নতুন আপলোড করা বিষয়কে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমাদের সামনে উঠে আসবে। ডানদিকে কর্মসূচী প্যানেলে বিবৃত থাকবে আমাদের এই সময়ের কর্মসূচী ও আন্দোলনের ডাক।

এছাড়াও Quick Link- এ প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইটের ঠিকানা। Govt. Order-এ সরকারী আদেশনামা। অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সমিতিসমূহের নাম থাকবে Affiliated / Fraternal Organisation-এ। State Conference থাকবে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সম্মেলনের পদাধিকারীদের নাম ও কেন্দ্রীয় কমিটির নাম। এছাড়াও Organisation Past & Present, Demand of Committee ও Aim, objects & Rules-এ থাকবে যথাযথ তথ্য। নীচে কাউন্টে দেখা যাবে কতবার এই সাইট খোলা হয়েছে।

সবশেষে এই ওয়েবসাইট সম্পর্কে বা সংগঠনের কোন বিষয়ে মতামত লেখার জায়গা রয়েছে নিজের মেইল আইডি লিখে পোস্ট সেখানেও আমরা মতামত লিখতে পারি যা কেন্দ্রীয় কমিটি জানতে পারবে।

শ্রমজীবীদের যে কোন সম্পদ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দাবি আদায়ের সুদীর্ঘ পথে সংগঠন-আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। সংগঠনে তা কিভাবে প্রভাব ফেলে তাকে গতিশীল করে। ব্যবহার না করলে সংগঠনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আসুন আমরা সবাই মিলে সংগঠনের এই সম্পদকে সাহসের সাথে, উদ্দীপনার সাথে ব্যবহার করি মতামত আদানপ্রদান করি।□ **মানস দাস**

সমিতিগুলির উদ্যোগে মে দিবস

ঐতিহাসিক মে দিবসের ১২৫তম বার্ষিকী পালিত হল **সমিতি ভবনে**। সমিতিভবনে অবস্থিত ১২টি সমিতির উদ্যোগে ১ মে বেলা ১টায় মে দিবস উদ্‌যাপন কর্মসুচীর সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট এণ্ড অ্যানিম্যাল হাসব্যান্ড্রি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অমল সরকার।

প্রথমে পতাকা উত্তোলন করে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি। এরপর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি অসিত ভট্টাচার্য ও তত্ত্বাবধায়ক কমিটির আহ্বায়ক সহ অন্য সব সমিতির নেতৃত্ব শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন।

এরপর তত্ত্বাবধায়ক কমিটির পক্ষে প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন প্রণব কর। তারপর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন। তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে মে দিবস পালনের গুরুত্ব নিয়ে বিশদে বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠান ১৭৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান শেষ হলে সদস্যরা কর্মচারী ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে সমিতি ভবনকে লাল আলোয় সাজানো হয়েছিল। □

গত ১ মে, ২০১৪ **ওয়েষ্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের** কেন্দ্রীয় দপ্তর '**প্রীতি ভবনে**' মে-দিবস প্রলিপালিত হয়েছে। প্রায় ২০জন সদস্য বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। রক্তপতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য অলকা মণ্ডল। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন যুগ্ম-সম্পাদিকা নমিতা রায়, 'মে-দিবসের প্রাসঙ্গিকতা ও আমাদের কর্তব্য এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছবি ঘাটা হালদার। সভা শেষে প্রত্যেকেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর কর্মচারী ভবনে মূল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। □

১৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিটে সমিতি দপ্তরে পতাকা উত্তোলন করেন সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক রবীন্দ্রনাথ গুহ রায়, শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন রবীন্দ্রনাথ গুহ রায়, দেবনাথ সেন, অসীম গাঙ্গুলী, তরুণ চন্দ্র দে এবং শিবপ্রসাদ বিশ্বাস মোট ৪টি সংগঠন থেকে ১৬ জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। মে দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন বেণু গোপাল দাস। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল নন মেডিক্যাল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নিজস্ব সমিতি দপ্তরে গভীর শ্রদ্ধার সাথে পালিত হলো মে-দিবসের কর্মসূচী। সভার সভাপতিত্ব করেন সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক পল্লব দাস। তিনি প্রারম্ভিক বক্তব্যে কর্মসূচীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। সভার মুখ্য বক্তা ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শান্তনু ভট্টাচার্য্য, তিনি অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে ঐতিহাসিক মে-দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। এরপর কর্মচারীরা কর্মচারী ভবনের কর্মসূচীতে যোগদান করেন। সভায় প্রায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। মে দিবস উপলক্ষে সমিতি দপ্তর চেন ফ্ল্যাগ ও লাল আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্ট্যান্ট এসোসিয়েশন-র উদ্যোগে সমিতি দপ্তরে 'মে দিবস' যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সহ-সভাপতি গোবিন্দরাম চক্রবর্তী। শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক লিটন কুমার পান্ডে। এরপর মে দিবস প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। □

পশ্চিমবঙ্গ ওয়ার্ক এ্যাসিস্ট্যান্টস এ্যাসোসিয়েশন-এর কেন্দ্রীয় ভবন '**দীনেন্দ্র ভবন**'-এ অন্যান্য বছরের মতো এবছরও যথাযথ মর্যাদায় মে-দিবসের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়েছে। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি প্রভঞ্জন ঘোষ। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়।

সভাকক্ষে অমর শহীদদের স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত সভার কাজ শুরু হয়। স্বাগত ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী। মূল আলোচক ছিলেন কোষাধ্যক্ষ বলদেব মুখার্জী। সভা পরিচালনা করেন সহ-সভাপতি প্রভঞ্জন ঘোষ। □

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে ১মে কেন্দ্রীয় ৫৫ জন সদস্যের উপস্থিতিতে 'মে দিবস' উদযাপিত হয়। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি দিলীপ ব্যানার্জী। পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র পাল ও দিলীপ ব্যানার্জী মে দিবসের তাৎপর্য ও বর্তমানে শ্রমজীবিদের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। কর্মসূচীর শেষে কর্মচারী ভবনের সমাবেশে সবাই সামিল হন। □

ফ্যাসিবাদ বিরোধী রবীন্দ্রনাথ

সুব্রত কুমার গুহ

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৪তম জন্মদিবসকে সামনে রেখে কবির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে ভারতবর্ষে পুনরায় ফ্যাসিস্ত শক্তির মাথাচাড়া দেওয়ার যে প্রবণতা এই মুহূর্তে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাকে গুরুত্ব দিয়েই বিশ্বকবির ফ্যাসিবাদ বিরোধী ভূমিকাতেই লেখনীকে সীমাবদ্ধ করতে চাই। কবি যৌবনকাল থেকেই সাম্রাজ্যবাদী দেশ সমূহের অপর দেশ লুণ্ঠন, আগ্রাসন, উপনিবেশবাদ, যুদ্ধ, বর্ণবিদ্বেষ ইত্যাদির বিরুদ্ধে গদ্যে, প্রবন্ধে, কবিতায় এবং বক্তৃতায় তীব্র ক্ষোভ ও ধিক্কার জানিয়ে এসেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কবি ছিলেন শান্তিনিকেতনে। যুদ্ধের সংবাদে ব্যথিত চিত্তে বিচলিত মননে তিনি ব্যক্ত করেন—''স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আহত হয়ে.. মরছে মানুষ, বাঁচাও তাকে।... বিশ্বপাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে সেই বিশ্ব পাপকে দূর করো।... বিনাশ থেকে রক্ষা করো। সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলেছিল! অনেকদিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে। আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। এক এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে উঠবার জন্য চেষ্টা করেছে। বর্মে চর্মে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে নিজে বেশি শক্তিশালী হবার জন্য তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শান দিয়েছে। পিস কনফারেন্স-এ শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ চলেছে; সেখানে কেবলই নানা উপায় উদ্ভাবন করে নানা কৌশলে এই মারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা হয়েছে।'' মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় তিনি এই ভাষণটি পাঠ করেছিলেন।

সমগ্র জীবন জুড়েই কবি দুর্বল ও আক্রান্ত দেশের প্রতিবাদী এবং প্রতিরোধ যুদ্ধকে নৈতিক সমর্থন করেছেন। যুদ্ধের সূচনাকালেই বেলজিয়ান সৈন্য অসীম সাহসিকতার সঙ্গে জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাতে থাকে। কবি লেখেন 'গীতালির' একটি কবিতায়—''বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে, / পথ জুড়ে কি করবি বড়াই? সরতে হবে। / লুট করা ধন করে জড়ো / কে হতে চাস সবার বড়ো, / এক নিমেষে পথের ধুলায় পড়তে হবে / নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে।...''

শিল্প ও কাব্যের স্বদেশভূমি ইতালির প্রতি কবির আকর্ষণ ছিল। ১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে ১৫ দিন ইতালিতে কাটিয়ে আসেন। পুনরায় ১৯২৬ সালে ফ্যাসিস্ত অন্দোলনের নায়ক মুসোলিনীর শহরে রোমে পৌঁছান তার অতিথি হিসাবে। মুসোলিনীর মস্তান বাহিনী 'ব্লাকশার্টস'-দের অত্যাচার, উৎপীড়ন, খুন জখম, রাজনৈতিক হত্যা, নেতৃস্থানীয় সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের নির্বাসন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী সমস্ত ব্যক্তি ও দলকে নির্মূল করা ইত্যাদি বীভৎস নারকীয় কর্মকাণ্ড তখন ইতালিতে সংগঠিত হচ্ছিল। কবি ইতালির উদ্দেশ্যে বললেন—'আমি আশা করছি বর্তমানের রক্তস্নান শেষে ইতালির অমর আত্মা অনির্বাণ আলোকে মণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।' মুসোলিনীকে তিনি বলেন—'রোমে আমি আপনার বলদৃপ্ত ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেছি। জানেন আপনিই পৃথিবীতে সর্বাধিক ভুল বোঝা মানুষ। আমিও অনেক দ্বিধা অনেক সংশয় সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম; কিন্তু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি খুবই আনন্দিত, কারণ তাতে অনেক ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত হয়েছে।' 'ইতালি থেকে সুইজারল্যান্ডের ভিলেন্যুভ-এ পৌঁছনোমাত্রই কবির ভাবনার জগৎ এক প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। সেখানে তখন অন্যান্য সংগ্রামী বুদ্ধিজীবীগণের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রোমাঁ রোল্যাঁ। ইতালিতে তিনি যেসব বক্তৃতা ও বিবৃতি দেন সংবাদপত্রে সেগুলো প্রচারিত হয়। সেগুলির আক্ষরিক অনুবাদ তাঁকে দেখানো হয়। এগুলি দেখেই তিনি উপলব্ধি করতে পারেন ফ্যাসিস্ত প্রচারযন্ত্র নিজস্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কিভাবে তাঁর বক্তব্য বা বিবৃতিকে বিকৃত করেছে। রোমাঁ রোল্যাঁর যুক্তির জালে কবির প্রকৃত জ্ঞান চক্ষুর উন্মোচন ঘটে। তিনি শান্তিনিকেতনে এমহার্স্টকে এক পত্রে লেখেন—'অবশ্যই অসম্পূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমি অভিমত ব্যক্ত করেছি; আর, বিশ্বভারতীর জন্য মুসোলিনী যা করেছেন তার জন্য তাঁর প্রতি আমার পক্ষপাতিত্বের মনোভাব থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সম্ভবত কোনো একদিন আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে এই ব্যক্তিটির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ঘটনা আমারই দূরদৃষ্টের এক অশুভ ষড়যন্ত্র; হয়তো বা যে ব্যক্তিত্ব তাঁর উপর আমি আরোপ করেছি তা আদপেই তাঁর নেই, সবটাই বাটপাড়ি।'

প্রবল মানসিক অস্থিরতা নিয়ে কবি সুইজারল্যান্ডের ভিলেন্যুভ ছেড়ে আসেন জুরিখে। সেখানে মিসেস সালভাদোরি ফ্যাসিস্ত বর্বরতা ও বিভীষিকার অনেক কাহিনী কবিকে শোনান। কবি বলেন—''ইতালিতে যেসব ভয়ঙ্কর ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে তা যদি আমি সুনিশ্চিতভাবে জানতাম, তাহলে সে দেশ সফরে আমি আসতাম না, কিছুতেই আসতাম না। যারা নির্যাতিত হয়েছেন তাদের কারও সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ হয়নি। এখন আপনাকে দেখে আমি আমার দায়িত্বের কথা উপলব্ধি করতে পারছি।'' তিনি আরও বলেন—''...এই ফ্যাসিবাদের কর্মপন্থা ও আদর্শ সমগ্র মানবগোষ্ঠীর চিন্তার বিষয়; এবং যে আন্দোলন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নির্দয়ভাবে দলন করে, ব্যক্তিকে বিবেকবিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণে বাধ্য করে এবং হিংসার রক্তমাখা পথ দিয়ে হেঁটে বেড়ায়, সেই আন্দোলনকে আমি কখনও সমর্থন করতে পারি এটা কল্পনা করাও অযৌক্তিক।'' ''অত্যাচারে উৎপীড়িত হওয়াটা সহনীয় হতে পারে, কিন্তু একটা মিথ্যা আদর্শকে অঞ্জলি দান করায় বাধ্য হওয়াটা সমগ্র যুগের পক্ষেই একটা অবমাননা, যদিও ঘটনাচক্রে একে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে।''

১৯২৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি প্যারী শহরে প্রথম একটি ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করেন এলবার্ট আইনস্টাইন, অ্যাঁরি বারবুস ও রোমাঁ রোল্যাঁ। এই সম্মেলনের আগে রবীন্দ্রনাথকে একটি আবেদনপত্র অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে বলেন, ''আপনার নাম হল সেইসব মহান সৎ ও বরণীয় নামগুলোর অন্যতম যাঁরা ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ও সংগ্রামে উন্নত

মস্তক হয়ে দাঁড়াবে।... এই ব্যাধির যে চিকিৎসা নেই তা নয়। একটা কিছু অবশ্যই করা যায়। আর ইতোমধ্যেই ফ্যাসিবাদ যেরূপ স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে তার প্রেক্ষিতে সকলের আগে অবিলম্বে যা করা যায় তা হলো একটা প্রবল নৈতিক প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া; সত্যিকারের গণ-বিবেককে সংগঠিত করা এবং সামগ্রিক ধিক্কারকে মর্মভেদী ভাষা দান করা, যা পৃথিবীর সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে।''

কবি ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়েই ছিলেন। তিনি বারবুসের প্রেরিত প্রতিবেদন ও আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাঁকে লেখেন—''বলা বাহুল্য যে, আপনার আবেদনের প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি রয়েছে; আর আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস, এর পশ্চাতে আছে অগণিত মানুষের কণ্ঠস্বর যারা সভ্যতার অন্তঃস্থল থেকে বর্বর হিংসার আকস্মিক আবির্ভাবে হতচেতন। পৃথিবীর আদিম জাতিসমূহের মধ্যে মানুষের রক্ত ঢেলে শক্তি উপাসনায় বিশ্বাস আমরা সাধারণত লক্ষ করে থাকি; নিষ্ঠুর পাশব শক্তির প্রতি তাদের আছে এক ভয়মিশ্রিত ভক্তি যে শক্তি প্রথমে বলপ্রয়োগ করে এবং তারপর তার শিকারগুলোকে ঘৃণ্য দাসত্বের বাধ্যতায় সম্মোহিত করে।... কিন্তু যখন অনুরূপ ঘটনা সভ্য জাতিসমূহের জীবনাচরণে অভিব্যক্তি লাভ করে তখন বুঝতে হবে যে সভ্যতার ভীমরতিজনিত দ্বিতীয় শৈশব শুরু হয়েছে, পাশব আবেগ-উচ্ছ্বাসের উপর এর নিয়ন্ত্রণ বিনষ্ট হয়ে গেছে।... এর সংক্রমণ অতিশয় অকল্যাণকর, কারণ একদিকে যখন সে অন্তঃস্থল থেকে ধ্বংস ও মৃত্যুর দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অপরদিকে তখন এর বাইরের অবয়ব পচনের রক্তিম আভায় চিকচিক্ করে ও স্ফীত হয়।'' ''... সুতরাং এই ভেবে আমি আনন্দ লাভ করছি যে পৃথিবীতে এমন মানুষও আছেন যাঁরা মানুষের উন্নততর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাঁদের দুঃখবঞ্চনার মধ্য দিয়ে তাঁরা মানব আত্মার মৃত্যুহীন জীবনেরই স্বাক্ষর রাখছেন, যা আপন বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সততই সংগ্রামে প্রস্তুত।''

১৯৩২ সালে ১ আগস্ট সমগ্র পৃথিবীব্যাপী 'আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিরোধী দিবস' পালিত হয়। কলকাতাতেও কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর উদ্যোগে এই দিবস পালন করা হয়। ১৯৩৫ সালে গড়ে ওঠে 'দ্য ওয়ার্ল্ড কমিটি এগেনস্ট ওয়্যার'। এতদসত্ত্বেও ফ্যাসিস্ত শক্তি দীর্ঘকালের প্রস্তুতি, ভীতি প্রদর্শন, জবরদস্তি এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করার পর ১৯৩৫ সালে অক্টোবর মাসে ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। আবিসিনিয়ার পতন ঘটে। এই ঘটনার দুই মাস আগে কলকাতায় একটি জনসভায় ইতালির আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র নিন্দা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ সি.এফ. এন্ড্রুজের কাছে লেখা এক চিঠিতে এই ন্যায়নীতিহীন বর্বর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রতি তাঁর তীব্র ধিক্কার ব্যক্ত করেন। ইতালির রাজনৈতিক পৈশাচিকতা তাঁর মননে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে সেই ক্ষত অনুভবে-উপলব্ধিতে-বিক্ষোভে একটি কালজয়ী কবিতার সৃষ্টি করে—আফ্রিকা। ''... এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে / নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে, / এল মানুষ-ধরার দল / গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে। / সভ্যের বর্বর লোভ / নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।''

জার্মানীর রাজনৈতিক আকাশে হিটলারের আবির্ভাব চমকপ্রদ। তিনি চ্যান্সেলর মনোনীত হন ১৯৩৩ সালে। ক্ষমতায় আসীন হয়েই তিনি হুইমার গঠনতন্ত্র বাতিল করেন এবং পার্লামেন্টকে বাধ্য করেন তাঁর হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে। নাৎসী ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে বেআইনী ঘোষণা করেন। ইহুদিদের বিরুদ্ধে শুরু করেন এক পরিকল্পিত আক্রমণ। এই নির্বাচনের প্রাক্কালে রাইখস্ট্যাগে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে সেই অছিলায় ঐ নাশকতার জন্য দায়ী অভিযোগে সমস্ত স্তরের কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, শান্তিবাদী ও প্রগতিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার, প্রচণ্ড পীড়ন ও নির্যাতনের নজিরবিহীন অভিযান শুরু করেন। নির্বাচন পরিণত হয় প্রহসনে। নাৎসীদের জয়লাভের সংবাদে উল্লসিত হয়ে ভারতে আনন্দবাজার পত্রিকা 'হের হিটলার ও নব্য জার্মানী' শিরোনামে প্রধান সম্পাদকীয় কলমে লেখে—''এই নতুন ডিক্টেটর হিটলারের বিরুদ্ধে আমরা অনেক কথাই শুনিতেছি। তিনি প্রতিপক্ষদিগকে নির্যাতন করিতেছেন, তাঁহার নাজীদলের উগ্র জাতীয়তার ফলে ইহুদিরা লাঞ্ছিত হইতেছে, কমিউনিস্টদের উপর ভীষণ নির্যাতন হইতেছে ইত্যাদি। মিথ্যা প্রচারদক্ষ ইউরোপের সংবাদদাতাদের এই সকল সংবাদের অধিকাংশ সত্য-নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা। হিটলারের মত স্বদেশপ্রেমিক স্বজাতির কলঙ্ক বৃদ্ধি হয় এমন কার্য করিবেন না বলিয়াই আমাদের ধারণা।... যে শক্তিমান বীর নূতন পতাকা হস্তে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে অন্যতম ভাগ্যবিধাতারূপে পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন তিনি হিটলার—সফলকাম নায়ক মুসোলিনীর শিষ্য, ফরাসীর দুশ্চিন্তার স্থল এবং ইংরেজের উৎকণ্ঠার কারণ। চারি বৎসর নহে—কয়েক মাসেই বোঝা যাইবে, বাক্যানুযায়ী কার্য কবিরার ক্ষমতা ও দক্ষতা ইহার আছে কি না?''

হিটলারের প্রাণনাশের অভিযোগে রবীন্দ্রনাথের পৌত্র সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর জার্মানীতে গ্রেপ্তার হন। অবশ্য কয়েকদিন পরেই তিনি মুক্তি পান। পৌত্রের গ্রেপ্তার, উৎপীড়ন কবির মননকে আন্দোলিত করে। ইউরোপে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ইতালি ও জার্মানী, এশিয়াতে সমরবাদী জাপান, এই ত্রয়ীর অশুভ সমন্বয়ে পৃথিবীর বুকে এমন এক জীবন দর্শন কায়েম করতে উদ্যত হয়েছিল ইতিহাসে যার তুলনা নেই। স্ব স্ব দেশে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনের পথে এই দর্শন স্বীকৃত মানবিক মূল্যবোধসমূহকে বিকৃত এবং ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।

এই ঘটনার অভিঘাতেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'কালান্তর'। একদা ইউরোপের বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কীভাবে ভারতসহ সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে তাদের আজ প্রায় একেবারে নির্জীব ও নিঃশেষ করে ফেলেছে তারই নিগুর বেদনা ও ক্ষোভ প্রস্ফুটিত হয়েছে এই নিবন্ধে। তিনি বললেন—''যে য়ুরোপে একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজাম্-এর নির্বিচার নিদারুণতা। এক দিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠেছে।... য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যেসব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জার্মানি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ, এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হল না। যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চারিদিকে উদঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বার বার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপীল পৌঁছবে আজ। কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি তুমি অশ্রদ্ধেয়, অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি 'বিনিপাত', বলার জন্য পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুর্দিনের মধ্যে দেখা দেয়—এই তো সকল দুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা। আজ পেয়াদার পীড়নে হাড় গুড়িয়ে যেতে পারে, তবুও তো আগেকার মতো হাত জোড় করে বলতে পারিনে, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা বলতে পারিনে, তেজীয়ান যে তার কিছুই দোষের নয়। বরঞ্চ মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের চেয়ে নিন্দনীয়।''

সমস্ত স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে কবির এই ধিক্কারবাণী। একই সঙ্গে এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান বাণী। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয় বুদ্ধিজীবী যিনি তাঁর এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধে ফ্যাসিবাদী ও নাৎসীবাদী এবং সমস্ত রকমের সাম্রাজ্যবাদী ও স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে তাদের ধ্বংস কামনা করলেন।

১৯৩৭ সালে ২৫ ডিসেম্বর কবি রচনা করেন দুটি অবিস্মরণীয় কবিতা। আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীন রণাঙ্গনে—সর্বত্রই ফ্যাসিস্তদের পৈশাচিক আক্রমণের সামনে মুক্তিফৌজের পরাজয়ের খবর আসছে—মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিসম্পাত এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে কবি লিখলেন—''নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, / শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস / বিদায় নেবার আগে তাই / ডাক দিয়ে যাই / দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে / প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।''

অপর কবিতা 'যেদিন চৈতন্য মোর'—''... মহাকাল সিংহাসনে / সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে, / কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী, নারীঘাতী / কুৎসিত বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন / নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের / হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধ কণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে / নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।''

বিশ্বব্যাপী বিপর্যকর পরিস্থিতির মধ্যে ২৫ বৈশাখ কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে ফ্যাসিস্তদের বিশ্বগ্রাসী বীভৎস পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার জানিয়ে 'জন্মদিন' কবিতায় তিনি লেখেন—'ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা / মাংসগন্ধ মুগ্ধ যাঁরা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা / শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি / বীভৎস চীৎকারে তাঁরা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি, / নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি। / শুনি তাই আজি

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

রবীন্দ্রনাথ

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

/ মানুষ-জন্তুর হুহুঙ্কার দিকে দিকে উঠে বাজি।''

এই কবিতাটি কবি তাঁর জন্মদিনে কালিম্পং থেকে বেতার অনুষ্ঠানের জন্য পাঠ করেন এবং টেলিফোন যোগে তা কলকাতা কেন্দ্র থেকেও প্রচারিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংবাদে কবির হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় তিনি অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীকে এক পত্রে লিখলেন—''দেখলুম দূরে বসে ব্যথিতচিত্ত মহা সাম্রাজ্য শক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দ্রংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী অপমান বারবার স্বীকার করল যা তার প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনো ঘটেনি। দেখলুম ঐ স্পর্ধিত সাম্রাজ্যশক্তি নির্বিকারচিত্তে এবিসীনিয়াকে ইটালির হাঁ করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জর্মনীর বুটের তলায় গুড়িয়ে ফেলতে

রবীন্দ্রনাথ ও রোমা রোল্যাঁ

চেকোশ্লোভাকিয়াকে; দেখলুম নন ইন্টারভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে করে দিতে—দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ করে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ইমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনাফা তো কিছুই হোলো না—পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হোলো দারুণ যুদ্ধে। এই যুদ্ধে ইংল্যান্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না।''

১৯৩৯ সালের খ্রীষ্ট জন্মদিনে রচিত 'বড়দিন' শীর্ষক একটি কবিতায় তিনি লেখেন—''একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে / রাজার দোহাই দিয়ে / এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি, / মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি—/ ঘাতক সৈন্যে ডাকি / 'মারো মারো' ওঠে হাঁকি।''

১৯৪০ সালের মে মাসে রচিত একটি কবিতায় কবি লেখেন অশুভের শ্মশানবিহার বিচূর্ণ করে মানবিক সৃজনশীলতার দিন প্রত্যাসন্নঃ ''এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান, / বীভৎস তাণ্ডবে / এ পাপযুগের অন্ত হবে, / মানব তপস্বীবেশে / চিতাভস্ম শয্যাতলে এসে / নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে / স্থান লভে নিরাসক্ত মনে—/ আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান / ঘোষিছে কামান।''

কবির শরীর দিন দিন অক্ষম অবসন্ন হয়ে পড়ছিল এবং ব্যাধির প্রকোপকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল তথাপি ইচ্ছা শক্তির জোরে তিনি শেষবারের মতো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করলেন তাঁর শেষ অভিসম্পাত, তার শেষ জন্মদিন উপলক্ষে রচিত তাঁর প্রতিবেদন 'সভ্যতার সঙ্কট'। এই রচনায় তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাতে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতবর্ষের বিবর্তনের ধারা উপস্থাপিত করেছেন। তিনি লিখেছেন—''... এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কিরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানব পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নিরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি?... জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু, **মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষপর্যন্ত রক্ষা করবো।** আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে... আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ-মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি।'' □

তথ্যসূত্র ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঃ কয়েকটি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—নেপাল মজুমদার,

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ—নেপাল মজুমদার,

রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব—অরবিন্দ পোদ্দার

যুদ্ধ কবির যন্ত্রণা—অমিতাভ চৌধুরী

বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ, প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্যের জীবনাবসান

প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ, প্রাবন্ধিক অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য। বিগত ২৪ মে'১৪ দুপুরে কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে জীবনাবসান হয় প্রাচীন ভারত ও সংস্কৃত সাহিত্যচর্চায় এক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত এই অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের। ২৩ মে দক্ষিণ কলকাতার নাকতলাস্থিত বাসভবনে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা বিফল করে ২৪ মে, দুপুর ২টা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বৎসর। তাঁর অঙ্গীকার অনুযায়ী আর জি কর হাসপাতালে তাঁর মরদেহ চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা মানবকল্যাণের স্বার্থে দান করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, সি আই টি ইউ নেতৃত্ব দীপক দাশগুপ্ত, শ্যামল চক্রবর্তী, অধ্যাপক অমিয় বাগচী, যশোধরা বাগচী, নবনীতা দেবসেন, তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, বিজয়া গোস্বামী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আমৃত্যু সাম্যবাদে বিশ্বাসী, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী সুকুমারী ভট্টাচার্যকে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন উল্লেখ করেছিলেন 'আধুনিক কালের গার্গী' হিসাবে। একদিকে, নারী চেতনার উন্মেষ ও নারী প্রগতির ক্ষেত্রে তিনি লেখার মাধ্যমে যেমন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তেমনই অপরদিকে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংযোজন করেছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য ১৯৭১ সালের ১২ জুলাই মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সরসীকুমার দত্ত বংশগতভাবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের উত্তরসুরি ছিলেন। সুকুমারী ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাশ করেন। বাঙালী খ্রিষ্টান পরিবারের মেয়ে বলে স্নাককোত্তর স্তরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়তে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত যখন ইংরেজি এম এ ক্লাসে ভর্তি হন, তখন পরীক্ষা প্রায় ঘাড়ের ওপরে। তাও সসম্মান উত্তীর্ণ হন তিনি। প্রতিবাদী রক্ত তার শিরায় বহমান ছিল। তাঁর পিতামহ বিপিনবিহারী দত্ত আচারবিচার কেন্দ্রিক হিন্দু ধর্মাচারণের নিষ্ঠুর অমানবিকতা স্বচক্ষে দেখে খ্রিষ্টান ধর্মগ্রহণ করেছিলেন। অসামান্য মেধাবী সুকুমারীদেবিকে ধর্মের কারণে শিক্ষা জীবন ও পরবর্তীকালে বারবার বাধা পেতে হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃত শিক্ষায় বাধা পেয়েছেন, বিখ্যাত ঈশান স্কলারশিপের সম্পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন সত্ত্বেও হিন্দু নন বলে তা পান নি। ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষার পাঠ শেষ করার পর তিনি অধ্যাপনাকেই পেশা হিসাবে বেছে নেন। প্রথমে যোগ দেন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের ইংরেজি বিভাগে। দশ বছর সেখানে অধ্যাপনার পর সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর আমন্ত্রণে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ ছেড়ে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে যোগ দেন। পরে সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি এম এ পাশ করেন এবং ১৯৬৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে ডক্টরেট পান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরই সংস্কৃত বিভাগে দীর্ঘদিন অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন সুকুমারী ভট্টাচার্য। এখানেও তাঁর ধর্মীয় পরিচয় ঘিরে সহকর্মীদের একাংশের আপত্তিতে সমস্যা হয়। ১৯৮৬ সালে তিনি অবসরগ্রহণ করেন।

বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে প্রায় পয়ত্রিশটি বই লিখেছেন তিনি। সুপরিচিত পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা শতাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ-প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে তাঁর লেখা প্রথম বই 'দ্য ইন্ডিয়ান থিওগনি' প্রকাশিত হয়। পরে বইটি কলকাতা থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল তাঁর অনুসন্ধান ও গবেষণার বিষয়। দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হয়েছে তাঁর গবেষণা। ১৯৭৩ সালে সাহিত্য আকাদেমি থেকে শুদ্রকের লেখা সংস্কৃত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের তাঁর করা বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

তাঁর লেখা গুরুত্বপূর্ণ বইগুলির মধ্যে রয়েছে—'লিটারেচার ইন দ্য বেদিক এজ ', 'প্রাচীন ভারত ঃ সমাজ ও সাহিত্য', 'প্রাচীন ভারত ঃ সমাজ ও নারী', 'বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য', 'বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য,' 'বাল্মিকির রাম', হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা'। এইসব বইগুলি সুকুমারী ভট্টাচার্যের মৌলিক বিশ্লেষণী চিন্তার স্বাক্ষর। মার্কসবাদে বিশ্বাস থেকেই পুরাণ, বেদ ও উপনিষদের যুগেও সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিষয়টি তাঁর অনবদ্য লেখনীর মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন পুস্তিকায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সুকুমারী ভট্টাচার্য বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ধর্মীয় গ্রন্থগুলিকে দেখেছিলেন। এই দর্শন থেকেই তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ 'লিগেন্ড অব দেবীস' গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছিলেন আর্য্য যুগের পূর্বের যে তথাকথিত 'সম্পদের দেবী' লক্ষ্মী, কিভাবে আর্য্য যুগে 'অলক্ষ্মী'তে পরিণত হয়েছিল। তাঁর মুক্তচিন্তার অনুশীলনে কোন কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তাই তাঁর লেখনিতে ফুটে ওঠে শাস্ত্র, পুরোহিত ও উচ্চবর্ণের কাছে নারী, শুদ্র ও অন্যান্য শ্রমজীবী কেউ পুরোপুরি মানুষ নয়। তাঁর উপলব্ধিতে প্রাচীন ভারতের মায়েরা ছিলেন সন্তানকে আনার ইচ্ছা, শিশুর মানসিক লালন-পালন ও শিক্ষাদান থেকে বঞ্চিত, শুধুমাত্র গর্ভধারণের যন্ত্রে পর্যবসিত।

ভারতচর্চা ও অন্যান্য গবেষণায় তাঁর অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁর জীবনে তিনি অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯৮৮ সালে 'আনন্দ পুরস্কার', ১৯৯৪ সালে 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার' ও 'রাহুল সাংকৃত্যায়ন পুরস্কার', ১৯৯৯ সালে মুজাফফর আহমেদ পুরস্কার পান তিনি। বাংলা আকাদেমির সদস্যা ও এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো হিসাবেও তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন।

তাঁর স্বামী প্রয়াত অমল ভট্টাচার্য ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক। একমাত্র কন্যা তনিমা সরকার ও জামাতা সুমিত সরকার জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে অধ্যাপনারত। তাঁর মৃত্যুকালে কন্যা ও জামাতা জার্মানিতে ছিলেন। □

শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা আর উমানাথ প্রয়াত

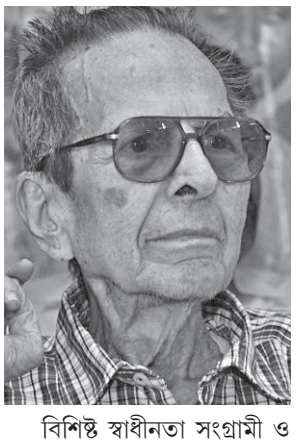

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শ্রমিক শ্রেণীর অন্যতম অগ্রণী সংগঠক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব আর উমানাথ গত ২১/৫/১৪ তারিখে তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীতে প্রয়াত হন। তিনি কালাগড়ের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ভজন গায়িকা হিসাবে জীবিকা অর্জন করতেন, তিনিও শৈশব থেকেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে মাকে সঙ্গ দিতেন। অনেক কষ্টের মধ্যে তিনি লেখাপড়া করেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা ছেড়ে দেন। তিনি বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে আসেন ১৯৩৯ সালে। ১৯৪০-৪১ সালে মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হয়ে আড়াই বছর বন্দী থাকেন। তিনি রাজনৈতিক জীবনে মোট সাড়ে নয় বছর জেল খেটেছেন। চল্লিশের দশকেই বস্ত্র, সিমেন্ট, বিড়ি ও রেল শ্রমিকদের সংগঠিত করতে সক্রিয় হন এবং তামিলনাড়ুর বিভিন্ন প্রান্তে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। সিআইটিইউ-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। সিআইটিইউ তামিলনাড়ুর প্রথম রাজ্য সম্পাদক ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন তিনি রাজ্য সিআইটিইউ-র সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। পরে সর্বভারতীয় নেতৃত্বে আসীন হন। ২০১০ সাল পর্যন্ত সিআইটিইউ-র সর্বভারতীয় সহসভাপতি ছিলেন। তিনি পুডুকোটাই কেন্দ্র থেকে দুবার সাংসদ এবং নাগাপাট্টিনাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দুবার তামিলনাড়ু বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৯২ বছর। □

হিন্দুস্তান মোটরস

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

দাবি করেছে অবিলম্বে কারখানা খোলার।

প্রায় একই অবস্থায় রাজ্যে একমাত্র মোটর গাড়ি তৈরীর কারখানা হিন্দুস্তান মোটরস-ও। কারখানা কর্তৃপক্ষ গত ২৪ তারিখে সাসপেনশন অব ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে কারখানার গেটে। ফলে প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক কর্মচারী এখন অথৈ জলে। বেশ কিছু দিন ধরেই ধুঁকতে থাকা হিন্দুস্তান মোটরস কর্তৃপক্ষ একে বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শক্তিশালী হয়ে ওঠা সেখানকার তৃণমূলী সংগঠন তাকে আমল দেয়নি। ফলে নির্বিচারে কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে রাতের অন্ধকারে মাল সরাতে শুরু করে। রাজ্য সরকার এ ক্ষেত্রেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। কিন্তু এখানেও এগিয়ে এসেছে সি আই টি ইউ ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের জড়ো করে এক কনভেনশনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে 'হিন্দমোটর বাঁচাও' কমিটি। দলমত নির্বিশেষে ডাক দেওয়া হয়েছে আন্দোলনে শামিল হওয়ার। সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে ঐ সাসপেনশন অব ওয়ার্কের নোটিশকে অবৈধ বলে ঘোষণা করার। গত ছয় মাস ধরে সেখানকার শ্রমিকেরা কোনো বেতন পাচ্ছেন না। এখন দেখার, সরকার এক্ষেত্রেও কি ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে শ্রমিকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে শেষপর্যন্ত তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাবেন! □

উৎসর্গ মিত্র

মহকুমা দপ্তরে হামলা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জানিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয় এবং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মহকুমায় গিয়ে ঘটনার খোঁজ খবর নিয়ে কর্মচারী ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অসিত কুমার ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ৬ জনের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল গত ২৬ মে'১৪ মহকুমা দপ্তরে গিয়ে সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখেন ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলেন। এই ঘটনায় সমগ্র মহকুমা জুড়ে কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় মানুষজন এর পেছনে অন্য উদ্দেশ্য আছে বলে জানান। রাজ্য জুড়ে ট্রেড ইউনিয়ন দপ্তরে হামলা, কর্মচারীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর যে হস্তক্ষেপ ঘটছে এই ঘটনা তা আর একবার দেখিয়ে দিয়ে গেল। □

অসিত ভট্টাচার্য

আন্তর্জাতিক সংবাদ

এল সালভাদরে পুনরায় বাম সরকার

নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি স্যাঞ্চেজ সেরেন

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এল সালভাদরের ঐতিহাসিক নির্বাচনে বামপন্থী দল 'ফারাবুন্দো মার্তি ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট' বা এল ফ্রেন্তে জয়ী হয়েছে। এই দলের প্রার্থী, যিনি অতীতে মার্কসবাদী গেরিলা কমান্ডার ছিলেন, সেই সালভাদর স্যাঞ্চেজ সেরেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সেরেন কট্টর দক্ষিণপন্থী দল 'ন্যাশনাল রিপাবলিকান অ্যালায়েন্স পার্টি' বা 'এরিনা'র প্রার্থী সান সালভাদর শহরের মেয়র নরমান কুইজানোকে ৯ মার্চ দ্বিতীয় দফায় ৬৩০০ ভোটে পরাস্ত করেছেন। সেরেন পেয়েছেন ৫০.১% ভোট। এরিনার ভোট কারচুপির তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে গত ১৬ মার্চ সে দেশের সুপ্রিম ইলেকটোরাল ট্রাইবুনাল সরকারীভাবে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসাবে সেরেনের নাম ঘোষণা করে।

নির্বাচনের ফলাফলে হতাশ পশ্চিমী মিডিয়া। সেই হতাশার চিত্র প্রত্যক্ষ করা গেছে 'ওয়াশিংটন পোস্ট', 'ফোর্বস', 'ইকনমিস্ট', 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স' সহ বিভিন্ন পত্রিকায়।

'আরেকটা নতুন ভেনেজুয়েলা হতে দেব না। আরেকটা নতুন সাভেজ বা মাদুরো হতে দেব না'— ঠিক এই ভাষাতেই সেরেনকে হুমকি দিয়েছেন পরাজিত চরম দক্ষিণপন্থী প্রার্থী কুইজানো। মধ্য আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশ এল সালভাদরের জনগণ বিভ্রান্ত না হয়ে বামপন্থাকেই বেছে নিয়েছেন। ভোটের প্রচারে কুইজানোর পাশে দাঁড়ায় দেশের সব ধনী, দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল বুর্জোয়ারা। নির্বাচনে কুইজানোর পক্ষে দেদার খরচ করে ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ। বামপন্থী দল এল ফ্রেন্তের বিরুদ্ধে ছিল মিডিয়ার ঢালাও প্রচার।

১৯৭৯-১৯৯২ দীর্ঘ তেরো বছরের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে এরিনা মিলিটারি জুন্টা সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের জানকবুল গেরিলা যুদ্ধের নেতা ছিলেন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি স্যাঞ্চেজ সেরেন। সরাসরি মার্কিন হস্তক্ষেপে চলা দীর্ঘমেয়াদী সেই গৃহযুদ্ধে প্রাণ গেছিল আশি হাজার মানুষের। ১৯৮৮-২০০৯ সে দেশে সরকার চালায় এরিনা। এই আমলে দারিদ্র্য, বেকারী, সামাজিক বৈষম্য, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় ব্যাপক হারে। ২০০৯-এ প্রথমবার ক্ষমতায় এসে এল ফ্রেন্তে গরীব মানুষের জন্য একগুচ্ছ কর্মসূচী গ্রহণ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অবৈতনিক স্কুল শিক্ষা, জাতীয় সম্পদের রাষ্ট্রীয়করণ, গরীব মানুষের আয় বৃদ্ধির পদক্ষেপ, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরিষেবা। এই সব কর্মসূচীর মধ্য দিয়েই গরীব সাধারণ মানুষের কাছের হয়ে উঠেছিল এল ফ্রেন্তে সরকার। বিগত সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন মার্সিও মিউনস্। সেই মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি সেরেন। লাতিন আমেরিকার 'নয়া ভেনেজুয়েলা' এল সালভাদর সত্যিই হয়ে উঠবে কিনা তা ভবিষ্যতই বলবে। □

দক্ষিণ আফ্রিকা

টানা পঞ্চমবারের জন্য জয়ী এ এন সি

বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার প্রয়াণের পর অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে ম্যান্ডেলার দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এ এন সি) দক্ষিণ আফ্রিকায় টানা পঞ্চমবারের জন্য জয়ী হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নেওয়া তথ্য অনুসারে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার অন্তর্গত জাতীয় সংসদের ৪০০টি আসনের মধ্যে এ এন সি পেয়েছে ২৪৯টি আসন। বিরোধী জোট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালাইন্স পেয়েছে ৮৯টি আসন এবং ইকনমিক ফ্রিডম ফাইটার্স পেয়েছে ২৫টি আসন। বাদবাকি আসনে জয়লাভ করেছে অন্যান্য কিছু ছোট দল। বিগত ৭ মে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভোট হয়। মোট ভোট পড়ে ৭৩ শতাংশ। এ এন সি পেয়েছে ৬২.১ শতাংশ (২০০৯ সালের নির্বাচনের তুলনায় কিছুটা কম)। বিরোধী জোট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালাইন্স ভোট পেয়েছে ২২.২ শতাংশ। (গতবারের তুলনায় ৫ শতাংশ ভোট বেশি)। নতুন একটি দল ইকনমিক ফ্রিডম ফাইটার্স, যারা ক্ষমতায় এলে গরিবদের মধ্যে সম্পদের বন্টনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা পেয়েছে ৬.৩ শতাংশ ভোট।

বিগত সময়ের কিছু জনবিরোধী ও শ্রমিকবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং সরকারী অর্থের অপচয় ইত্যাদি প্রসঙ্গ ভোটে প্রভাব ফেলেছে। এই কারণে এ এন সি'র ভোট কমেছে। ২০১৪'র নির্বাচন এ এন সি-কে সাময়িক স্বস্তি দিলেও, জনসমর্থন ফিরে পাওয়াই প্রয়াত জননেতা ম্যান্ডেলার দলের কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ। □

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের স্বাস্থ্য ও গৃহনির্মাণ প্রকল্প বিষয়ক অর্থ দপ্তরের আদেশনামা—২০৮৯ এফ.বি. তাং-২৮-০২-২০১৪

কর্মচারীদের সামনে গাজর ঝোলানোর আরও একটি নমুনা

বর্তমানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ৪২% মহার্ঘভাতা বাকি। কেন্দ্রীয় সরকার সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করে ফেলেছে। অথচ রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে বলে দিয়েছে যে যদি কেন্দ্র সরকার টাকা দেয় তবেই বেতন কমিশন সম্পর্কে চিন্তা করা যাবে, নচেৎ নয়। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা দারুণ ক্ষুব্ধ। এমনকি শাসকদলের অনুগত কর্মচারী সংগঠনগুলির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে পর্যন্ত এ ব্যাপারে তীব্র অসন্তোষ রয়েছে। এই অবস্থায় লোকসভা নির্বাচনের আগে অনুগত কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করতে 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন'-এর নামে গত ২২/০২/২০১৪ তারিখে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং একটি সভা ডেকেছিলেন। অনেক কর্মচারী ভেবেছিলেন মহার্ঘভাতা সংক্রান্ত কোনো ঘোষণা ঐ সভা থেকে হয়ত করবেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু উপস্থিত কর্মচারীরা দেখলেন মহার্ঘভাতা সংক্রান্ত কোনো ঘোষণা সেখানে মুখ্যমন্ত্রী তো করলেনই না, বরং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভেঙে ফেলার মহান দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করলেন তিনি। এই যে গুরুভার উপস্থিত কর্মচারীদের উপর তিনি চাপিয়ে দিলেন বোধহয় তা কিছুটা প্রশমনের উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে আরও দুটি ঘোষণা করলেন—প্রথমটি সরকারী কর্মচারীদের আবাসন সংক্রান্ত একটি ঘোষণা এবং অপরটি ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ ক্যাশলেশ করার ঘোষণা, তিনি মঞ্চ থেকেই মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ফোনে অর্থমন্ত্রীকে ফোন করে তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে দেন ক্যাশলেস প্রকল্পটির চালু করার কথা।

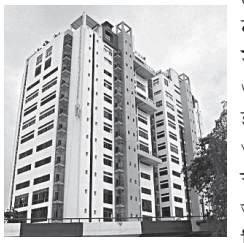

এরপর গত ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে অর্থ দপ্তর থেকে ৬৪৬(১০০)—এফ(মেড) ডব্লিউ বি নং একটি আদেশনামা বের হয়। ঐ আদেশনামায় ডব্লিউ বি এইচ এস -২০০৮ প্রকল্পে যে বেসরকারী হাসপাতাল বা নার্সিংহোমগুলি রয়েছে তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে তারা এই ক্যাশলেস প্রকল্পের মধ্যে আসতে চায় কিনা। এরজন্য ১৫দিন সময় দেওয়া হয়। আবার এর ঠিক পরদিনই অর্থাৎ ২৮/০২/২০১৪ তারিখে অর্থ দপ্তর ২০৮৯-এফ বি নং একটি আদেশনামা বের করে। এই আদেশনামায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের স্বাস্থ্য এবং গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য তিনটি ব্যবস্থা নেবার কথা বলা হয়েছে। প্রথমত গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প 'আকাঙ্খা'-এর সূচনা। এই প্রকল্পে প্রাথমিকভাবে গৃহনির্মাণের জন্য ঋণ দেবার জন্য ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় বিনা পয়সায় গৃহনির্মাণের জন্য জমি দেবার ঘোষণাও রয়েছে। দ্বিতীয়ত ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কীম-এ নাম নথিভুক্ত করার সময়সীমা বৃদ্ধি করে ৩১/০৩/২০১৫ করা হয়েছে। তৃতীয়ত ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কীমে হাসপাতালের অন্তর্বিভাগ চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর কাছ থেকে না নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করবে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে একই আদেশনামায় বলা হয়েছে যে এই ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য বিশদ পদ্ধতিগত ব্যাপার সংক্রান্ত আদেশনামা পরবর্তীকালে প্রকাশ করা হবে।

এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই আদেশনামাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের সদিচ্ছা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেছে। প্রতিটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যবস্থাগুলি ঘোষণা করার আগে প্রশাসনের এই ব্যাপারে বিশদে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন ছিল। যদি কর্মচারী প্রতি ৫ লক্ষ টাকা করেও গৃহঋণ দেওয়া হয়। তাহলে ১০০ কোটি টাকায় মাত্র ২০০০ জন কর্মচারীকে গৃহঋণ দেওয়া যাবে। যেটা সমগ্র কর্মচারী সমাজের তুলনায় নগণ্য অংশ মাত্র। বর্তমানে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহঋণ নেবার যে ব্যবস্থা চালু আছে তার সঙ্গে ঘোষিত ব্যবস্থা চালু হলে কোনো দ্বন্দ্ব হবে কিনা তা নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা করা হয়েছে বলে মনে হয় না। ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ সরাসরি রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করতে কটি হাসপাতাল রাজি আছে তা আগে জেনে নিয়ে তবে ক্যাশলেস প্রকল্পটি নিয়ে ঘোষণা করলে ভাল হয়। যদি এক অংশের হাসপাতাল এই প্রকল্পটি গ্রহণ করতে না চায় তবে এরকম ক্যাশলেস চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্যানেলভুক্ত হাসপাতালের সংখ্যা আরও কমে যাবে।

স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক বেশি চিন্তাভাবনা করে প্রশাসনের এই আদেশনামা প্রকাশ করা উচিৎ ছিল। তার বদলে যেরকম অগোছালোভাবে এই আদেশনামাটি বের হয়েছে তাতে একথা মনে করার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে যে সাময়িকভাবে কর্মচারীদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যেই এই আদেশনামাটি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী দিনে এই আদেশনামাটিকে কার্যকরী করার পদ্ধতি বিষয়ক যে সকল আদেশনামা বের হবে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। □

প্রণব কর

সমিতির কর্মসূচী

ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভে এ্যান্ড ড্রইং এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের দাবি দিবস

গত২৮ মার্চ ২০১৪ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হল-এ **ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভে এ্যান্ড ড্রইং এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন**-র উদ্যোগে ১২ দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় সাধারণ সভা ও প্রস্তাব গ্রহণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণ সভা পরিচালনা করে সংগঠনের সভাপতি মলয়শংকর ঘোষ ও সহ সভাপতিত্রয়কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী। মুখ্য সচিবের উদ্দেশে প্রেরণের জন্য ১২ দফা দাবি সম্বলিত প্রস্তাব পেশ করেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক তপন দাস, প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ মুখার্জী। সাধারণ সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাব মুখ্য সচিবকে ফ্যাক্স মারফৎ প্রেরণ করা হয়েছে। কর্মসূচীর কথা এবং দাবি প্রস্তাব নিয়ে মুখ্য সচিবের সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য পূর্বে পত্র দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মুখ্য সচিবালয় পত্র গ্রহণ করলেও সাক্ষাৎ কারের জন্য কোনো সময় দেয়নি।

উক্ত সভায় কলকাতার অঞ্চল, পার্শ্ববর্তী জেলার সদস্য সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। মোট ১৩৯ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সভায় রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ সম্পাদক বিজয়শংকর সিংহ অতীব মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

জেলা/অঞ্চলগতভাবে ২০-২৬ মার্চ ২০১৪ সাধারণ সভা করে প্রস্তাব গ্রহণের কর্মসূচী নির্দিষ্ট থাকলেও নির্বাচনী কাজে বিভিন্ন জেলার সদস্য-কর্মীরা যুক্ত থাকার কারণে সব জেলাতে কর্মসূচী করা না গেলেও ৭টি জেলা ২টি অঞ্চল কর্মসূচী করে মুখ্য সচিবের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেছে যদিও জেলাশাসক নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকায় সাক্ষাৎকারের সুযোগ হয়নি। জেলাশাসকদের পত্র দিয়ে জানানো হয়েছে।

যে সব জেলা/অঞ্চলে কর্মসূচী বাকি আছে তা করা হবে এবং পরবর্তীতে কেন্দ্রীয়ভাবে বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকদের গৃহীত দাবি প্রস্তাব নিয়ে সংগঠনগত ভাবে পত্র দেওয়া হবে। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। □

দৃষ্টি আকর্ষণী

জেলা/অঞ্চল/সমিতি

- **সংগ্রামী হাতিয়ারের সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনদাতা ও গ্রাহকদের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।**
- **নতুন গ্রাহক বর্ষে সংগ্রামী হাতিয়ারের গ্রাহক সংখ্যা দ্রুত কেন্দ্রীয় দপ্তরে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।**

পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী

সমিতির কর্মসূচী

পঃবঃ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের ১১দফা দাবিকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ সমাবেশ

গত ২২ এপ্রিল ২০১৪, রাজ্যের বর্তমান কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ভবন নবান্ন-র কাছে শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে অফিস ছুটির পর মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বকেয়া ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, পি এফ আর ডি এ বিল প্রত্যাহার, ধর্মঘট সহ বিভিন্ন ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকার হরণের চেষ্টা বন্ধ সহ ১১ দফা দাবিতে পঃবঃ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভার শুরুতে আই পি টি এ, হাওড়া শাখা গান পরিবেশন করে। এরপর সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিলন দাস ভূমিকা সহ ১১ দফা দাবি পেশ করেন। তারপর সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক সুদীপ পাল দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেন।

দাবি পেশ ও সমর্থনের পর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের প্রারম্ভেই তিনি রাজ্য প্রশাসনে যে ব্যাপক বদলী চালু করা হয়েছে তার উল্লেখ করেন। অত্যন্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই বদলিনীতি তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলেন এবং এর ফলেই এই সমিতিকে গঙ্গার অপর পারে এসে কর্মসূচী পালন করতে হচ্ছে তাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এসময়ে অবস্থা পরিবর্তন করতে হলে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সাহসী ও আত্মত্যাগী মানসিকতা নিয়ে কর্মচারীদের সংগঠনের কাজ করতে হবে। যৌথ কনভেনশন থেকে ওঠা ৯ দফা দাবি নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করতে গিয়ে সেখানে কর্মচারীদের ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকারগুলিকে খর্ব করার চেষ্টা সংক্রান্ত যে অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে তাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যে ২০০৯ সালে বা ২০১১ সালে যে পরিস্থিতি ছিল ২০১৪ সালে সেই পরিস্থিতি নেই। কর্মচারীকে তার অভিজ্ঞতার নিরিখেই ভোট দান করে পরিস্থিতি পরিবর্তনে সচেষ্ট হতে হবে বলে উপস্থিত কর্মচারীদের কাছে তিনি আবেদন জানান।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অশোক ঘোষ। □

প্রণব কর

সাংস্কৃতিক কর্মসূচী

রবীন্দ্র জয়ন্তী ঃ গত ৯ মে, (২৫ বৈশাখ), ২০১৪ সন্ধ্যা ৬-০০ টায় **জলপাইগুড়ি জেলা** কর্মচারী ভবনে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয়। রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মাল্যদান করেন জেলার প্রবীন নেতা তপন মৈত্র। পরবর্তীতে স্বাগত ভাষণ দেন জেলা সম্পাদক সত্যজিৎ ঘোষ। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি জেলা সাংস্কৃতিক শাখার পরিচালনায় গীতি আলেখ্য, রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
43rd Year 1st Issue, May 2014

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন ২০১৪

রাজ্যের ফলাফলে সন্ত্রাসের প্রভাব এবং ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত

গোটা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বমোট ৪২টি আসনের মধ্যে ৩৪টি আসনে জয়ী হয়েছে। বামফ্রন্ট ২টি, কংগ্রেস ৪টি এবং বিজেপি ২টি আসনে জয়ী হয়েছে। মোট পাঁচ দফায় এই রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি দফায় শাসকদলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও রিগিং-এর অভিযোগ করেছে বিরোধীদলগুলি। এমনকি প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতেও সেই ধরনের ছবি ও রিপোর্টিং প্রত্যক্ষ করেছেন রাজ্যবাসী তথা গোটা বিশ্ব। তা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন নির্বাচকদের মতদানের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই বিরোধীদের অভিযোগ। সন্ত্রাস আক্রমণের শিকার হয়ে বেশ কয়েকজন বামফ্রন্ট কর্মী সমর্থক হতাহত হয়েছেন। এমনকি শেষ দফার নির্বাচনের পর থেকে শুরু হয়েছে নতুন উদ্যোগে সন্ত্রাস। বেশ কিছু জায়গায় বামফ্রন্ট কর্মী সমর্থকরা ঘরছাড়া অবস্থায় রয়েছেন।

নির্বাচনী ফলাফলে আসন সংখ্যার থেকেও নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে ভোট বন্টন চিত্রে। বামফ্রন্টের ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ভোট ছিল ৪১ শতাংশ যা এবার হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২৯ শতাংশ। কিন্তু আসন সংখ্যা কমেছে আরও অনেক বেশি। বামফ্রন্ট দুটি আসন (রায়গঞ্জ ও মুর্শিদাবাদ) পেয়েছে এবং ৩৫টি আসনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের তিনভাগের একভাগ (৯.৫৮ শতাংশ) ভোট পেলেও আসন জিতেছে বামফ্রন্টের দ্বিগুণ। কংগ্রেস ৪টি আসনে জয়লাভ করেছে (মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, বহরমপুর ও জঙ্গীপুর) এবং ২টি আসনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে (রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ)। এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল এই রাজ্যে বিজেপির পক্ষে ভোটের হার বৃদ্ধি। এককভাবে লড়াই করে তারা ২টি লোকসভা আসন (দার্জিলিঙ ও আসানসোল) জয়লাভ করলেও তিনটি লোকসভা আসনে তারা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এগুলি হল কলকাতা উত্তর (২৬ শতাংশ), কলকাতা দক্ষিণ (২৫ শতাংশ) এবং মালদহ দক্ষিণ (২০ শতাংশ)। শুধু তাই নয় ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের ৪ শতাংশ থেকে ভোট বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৭ শতাংশ। ৯টি কেন্দ্রে বিজেপি'র প্রাপ্ত ভোট ২০ শতাংশের বেশি। এগুলি হল আলিপুরদুয়ার (২৮ শতাংশ), বালুরঘাট (২১ শতাংশ), কৃষ্ণনগর (২৭ শতাংশ), ব্যারাকপুর (২২ শতাংশ), দমদম (২২ শতাংশ) বারাসত (২৩ শতাংশ), বাঁকুড়া (২০ শতাংশ), শ্রীরামপুর (২৮ শতাংশ), হাওড়া (২২ শতাংশ)।

শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটের হারও কমেছে। এবার তারা পেয়েছে ৩৯.৩৬ শতাংশ ভোট, যদিও আসন সংখ্যা বেড়ে ৩৪ হয়েছে। আসনের হিসেবে ৮০ শতাংশ। গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের জোট পেয়েছিল প্রায় ৪৬ শতাংশ ভোট, গত বিধানসভা নির্বাচনে পেয়েছিল ৪৮ শতাংশ ভোট।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে বহুদিন বাদে পশ্চিমবঙ্গে চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। ফলাফলের ক্ষেত্রে একথা বলা যায় এই ফলাফল কখনই সম্পূর্ণ জনমতের প্রতিফলন নয়। শাসকদলের সন্ত্রাস, রিগিং, ছাপ্পাভোট, বুথদখল এই নির্বাচনে প্রকৃত জনমতের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তবে একই সাথে এই নির্বাচনের ফল আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখ নির্দেশ করছে। এই অভিমুখগুলির বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গ আকারের ভবিষ্যতে নিশ্চয় প্রকাশিত হবে। তবে এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং শঙ্কার কারণ হল সাম্প্রদায়িক শক্তির তাৎপর্যপূর্ণ ভোট বৃদ্ধি। দেশজুড়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি-র পক্ষে যে ব্যাপক প্রভাব সংগঠিত হয়েছে তার প্রভাব পড়েছে রাজ্যের ফলাফলেও।□

মানস কুমার বড়ুয়া, দেবাশীষ রায়

পোস্টাল ব্যালটে বেশিরভাগ আসনে জয়ী বামপন্থীরা

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে শাসকদল পাঁচভাগের চারভাগ আসনে জয়ী হলেও (৩৪টি) পোস্টাল ব্যালটের ভোটে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২৫টি আসনে জয়ী হয়েছে বামপন্থীরা। সাধারণভাবে নির্বাচন কর্মী হিসাবে সরকারী কর্মচারীরাই প্রধানত দায়িত্ব পালন ও পোস্টাল ব্যালটে মতদান করেন। এবারের নির্বাচনে কর্মী হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যদের ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল। প্রায় ৪০ হাজার সরকারী কর্মচারী ভোটের কাজে নিযুক্ত হলেও মাত্র ১২ হাজার কর্মী পোস্টাল ব্যালট পান। বহু নির্বাচন কর্মী ইডি ভোট দিতে পারেন নি। এতদসত্ত্বেও এই ফলাফলে শাসকদল সম্পর্কে সংগঠন ব্যতিরেকে কর্মচারীদের মনোভাব স্পষ্ট। □

ফের একদলীয় শাসন দিল্লীতে

দেশের কর্পোরেট লবির প্রত্যাশা মতই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠান করলো ভারতীয় জনতা পার্টি। এখন সেই লবিরই ইচ্ছায় দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন গুজরাটের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই মোদি। কংগ্রেসের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা, প্রায় সমস্ত গণমাধ্যমের প্রবল প্রচার আর নানান রাজনৈতিক দলের উপর বহুধা বিভক্ত সমর্থনের মধ্যে বিজেপি জয়ী হয়েছে বিপুলভাবে! পাশাপাশি কংগ্রেসের অবস্থা একেবারে তলানিতে। ৫৪৩ আসন বিশিষ্ট দেশের সংসদে গতবারে ১৯৮টি আসন দখল করা কংগ্রেস এবারে পেয়েছে মাত্র ৪৪টি আসন। অর্থাৎ গতবারে সরকার গঠনকারী দলটি এবারে মোট আসনের দশ শতাংশও দখল করতে পারেনি এবং বিরোধী দলের মর্যাদাটুকুও পাবে না তারা, কারণ লোকসভার নিয়ম অনুযায়ী বিরোধী দলের মর্যাদা পেতে গেলে মোট আসনের অন্ততঃ ১০ শতাংশ আসন পাওয়া দরকার।এত লজ্জায় কখনো পড়েনি এই শতাব্দী প্রাচীন দলটি। অন্য দিকে গতবারে ১১২টি আসন পাওয়া বিজেপি তাদের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ২৮২ করে ফেলেছে। অর্থাৎ প্রায় ২৫ বছর বাদে দেশে আবার এক দলীয় শাসন চালু হতে চলেছে। তবে এটাও এখানে মনে রাখা দরকার যে এতগুলো আসন পেলেও শতাংশের হিসেবে তারা পেয়েছে মাত্র ৩১ শতাংশ আর এনডিএ-র মিলিত ভোটের পরিমাণ মাত্র ৩৮.৫ শতাংশ। এব্যাপারটা রীতিমত ভাবার যোগ্য! এত কম ভোট পেয়ে কেন্দ্রে কোনদিন কোনো দল সরকার গড়েনি— তাও আবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। সব মিলিয়ে দেশের ব্যবসায়ী মহল দারুণ উচ্ছসিত। নরেন্দ্র মোদির উত্থানে তারা ফের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্বক্ষেত্রগুলিকে দখল করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য যে, এবারের নির্বাচনে করুণানিধির ডিএমকে এবং মায়াবতীর বিএসপি একটাও আসন দখল করতে পারেনি। মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টি, লালু প্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল এবং নীতিশ কুমারের জনতা দল (ইউ)-এর কার্যত নির্বাচনী বিপর্যয় ঘটেছে। বামপন্থীদের অবস্থাও হয়েছে শোচনীয়। তাদেরও আসন কমে গিয়েছে গতবারের তুলনায়, তবে কেরালায় তাদের আসন সংখ্যা ৪ থেকে বেড়ে ৮ হয়েছে আর ত্রিপুরায় ঐতিহ্য অনুযায়ী দুটি আসনেই বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। সংক্ষেপে সংসদে এবারের আসনচিত্র পাশের সারণীতে দেয়া হয়েছে।

বিজেপি	২৮২
সিপিআই	১
সিপিআই(এম)+নির্দল	১১
কংগ্রেস	৪৪
এনসিপি	৬
আম আদমি পার্টি	৪
এডিএমকে	৩৭
তৃণমূল কংগ্রেস	৩৪
বিজেডি	২০
জে এম এম	২
কেরালা কংগ্রেস (এম)	১
লোক জনশক্তি	৬
আরজেডি	৪
সমাজবাদী পার্টি	৫
আকালী দল	৪
শিবসেনা	১৮
টিআরএস	১১
টিডিপি	১৬
আপনা দল	২
রাষ্ট্রীয় লোক সমতা পার্টি	৩
ওয়াইএসআর কংগ্রেস	৯
অন্যান্য	২৩
মোট	**৫৪৩**

এবারেই প্রথম নির্বাচন কমিশন 'নোটা' বা 'নান অফ দ্য এবাভ'-এর সুযোগ দিয়েছিল নির্বাচকমণ্ডলীকে। প্রাপ্ত ভোটের প্রায় একশতাংশ 'নোটায়' ভোট দিয়েছেন। যাই হোক, বিপুল প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা দখল করলো বিজেপি। এখন দেখার তারা কাদের স্বার্থ রক্ষা করতে তৎপর থাকে— চিরাচরিতভাবে ব্যবসায়ীদের, না প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আম জনতার। তবে অভিজ্ঞতা বলছে যে তারা আগের মতই ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষাতেই মগ্ন থাকবে, বিপন্ন হয়ে পড়বে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রগুলি। □

উৎসর্গ মিত্র, সুগত দাস

দেশের পঞ্চদশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বিগত ২৬ মে রাষ্ট্রপতিভবনে শপথ নিলেন দেশের পঞ্চদশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপরেই শপথ নেন আরও ৪৪ জন মন্ত্রী। মোট ৪৫ জনের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রয়েছেন রাজনাথ সিংহ, অরুণ জেটলি, সুষমা স্বরাজ, নীতিন গড়কড়ি, ভেঙ্কাইয়া নাইডু, স্মৃতি ইরানি প্রমুখ। এছাড়াও রয়েছেন বিজেপি-র সহযোগী এনডিএ ভুক্ত লোক জনশক্তির রামবিলাশ পাসোয়ান, তেলেগু দেশমের অশোক গজপতি রাজু, শিবসেনার অনন্ত গীতে, আকালি দলের হরমনপ্রীত কাউর মন্ত্রী হয়েছেন। তবে যে বিষয়গুলি লক্ষ্যণীয় তা হল, দপ্তর বণ্টনের পূর্বে একাধিক মন্ত্রক ও দপ্তরের সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে মন্ত্রিসভাকে আকারে ছোট করার যে ঘোষণা হয়েছিল, বাস্তবে তা মানা হয়নি। তবে একাধিক মন্ত্রক ও দপ্তরকে একজন মন্ত্রীর অধীনে আনা হয়েছে। এইভাবে ১৭টি মন্ত্রকের দায়িত্বে রয়েছেন ৭ জন মন্ত্রী। দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিসভা সদস্যদের কাছে এই বার্তা পাঠানো হয়েছে, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ গুজরাটের মতো কেন্দ্রেও মোদীসর্বস্ব মডেল অনুসরণ করা হবে। তৃতীয়ত জোট শরিকরা তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পেয়েছেন। মোট ৪৫ জনের মন্ত্রিসভায় ২৪ জন পূর্নমন্ত্রী, ১০ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ১১ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ সহ সার্কভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্র প্রধানরা যেমন উপস্থিত ছিলেন, তেমনই উপস্থিত ছিলেন আম্বানি-আদানিসহ দেশের প্রথম সারির শিল্পপতিরা এবং গেরুয়া বসনধারী আরএসএস-এর সাধুসন্তরা। □

ভোট মিটতেই বন্ধ হল রাজ্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ কারখানা জেশপ ও হিন্দুস্তান মোটরস—নীরব রাজ্য সরকার

আশঙ্কাকে সত্যিতে পরিণত করে ভোটের ঠিক পরেই বন্ধ হয়ে গেল জেশপ কারখানা। খসে পড়লো রাজ্য সরকারের শ্রমিক দরদী মুখোশ! এর আগে বারে বারে সেখানকার শ্রমিকদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে অধিগ্রহণ করা হবে বলে... কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে সে সবই ছিল নির্বাচনী বৈতরণি পার হওয়ার কৌশল আর পাঁচটা প্রতিশ্রুতির মতো! এর আগে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কারখানা জেশপকে বেসরকারী করা হয় ২০০৩ সালে, কেন্দ্রে বিজেপি-র শাসনকালে। তখন সেখানকার মন্ত্রী ছিলেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। তাতেও আটকায়নি জেশপের বিলগ্নীকরণ। তারপর থেকে নানা ভাবে শ্রমিকেরা বর্তমান শাসক দলের নানা ছোটো-বড়ো নেতাদের কাছ থেকে সমানে প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন আর বারে বারে আশায় বুক বেঁধেছেন, 'জয়েন্ট ফোরাম অব অ্যাকশন' তৈরী করে তার চেয়ারম্যান বানিয়েছেন সৌগত রায়কে। এমনকি এবারে লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগেও স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জেশপের গেটে গিয়ে শুনিয়ে এসেছিলেন আশার কথা, বলে এসেছিলেন রাজ্য সরকার দ্রুত অধিগ্রহণ করবে জেশপকে—ঘুরিয়ে বলতে চেয়েছিলেন নির্বাচনে তাঁর দলকেই ভোট দিতে। এর চেয়ে বড়ো পরিহাস আর কিছু হয় না। তাঁর প্রতিশ্রুতির পর এক সপ্তাহও গেল না, গত ১৫ তারিখে শ্রমিকেরা গেটে গিয়ে সাসপেনশন অব ওয়ার্ক নোটিশ ঝুলতে দেখলেন।

হিন্দমোটর বন্ধের প্রতিবাদে শ্রমিক কনভেনশন

সরলমতি শ্রমিকেরা বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু এমনটা যে পারে, তার আঁচ পাওয়া গিয়েছিল গত বছরেই। ঐ বছর প্রাক্তন নকশাল নেতা, বর্তমান রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী জেশপ কর্তৃপক্ষকে আশ্চর্যজনকভাবে চিঠি দিয়ে জানান যে তারা ইচ্ছে করলেই কারখানা বন্ধ করে দিতে পারেন। সেই মোতাবেক কর্তৃপক্ষও সরকারকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয় যে, তারা ঐ বছরেরই ১৫ নভেম্বরের মধ্যে কারখানা পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দিতে চায়। শ্রমমন্ত্রীর সে চিঠি প্রকাশ হয়ে পড়ায়, শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ায় তাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে সরকার। কিন্তু এর থেকেই সরকারের মনোভাবের আন্দাজ পাওয়া যায়। লোক দেখানো তড়িঘড়ি একটা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছিল বটে, কিন্তু যথারীতি তার প্রায় কোনো সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়নি। ফলে অস্থিরতা বাড়তে থাকে এবং শেষে শুরু হয় ইউনিয়নের নেতাদের মদতে কারখানায় চুরি। কর্তৃপক্ষ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল, ঝুলিয়ে দেয় সাসপেনশন অব ওয়ার্কের নোটিশ। সরকার এবং কর্তৃপক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপে মত্ত, শ্রমিকেরা দিশাহারা। সেখানকার ৬৫৪ জন শ্রমিক এমনিতেই গত ৭ মাস বেতন পাচ্ছিলেন না। এখন এই অবস্থায় তাঁরা জানেন না তাঁদের কি করণীয়, আগামীকাল তাঁদের চলবে কি ভাবে! এই অবস্থায় তাঁদের পাশে আছে একমাত্র শ্রমিক ইউনিয়ন 'সিটু'। ফোরামের পক্ষ থেকে তারা

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।